বিধু মাষ্টার

বাক্স-বদল

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হোত না। সবে স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পুজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটর-বাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে না গেলে কি চলত না?

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। বাক্স, সুটকেস, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশির ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি ওঁরা জুড়ে বসে আছেন। মেয়েমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তাদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হোল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা ভাল বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁরা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পরস্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সিট। দুটি মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবত মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি, সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু একবার অল্পক্ষণের জন্যে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারি আছে বলে, এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি।

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ!

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের এখন গেয়ান কি হয়েছে বাবু? খোকাবাবুর নাম কি ও খোকাবাবু?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু' একটা চাষা-গাঁ।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে, ভীষণ কষ্ট হোত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কি না।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজী বই—'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স'। ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পৌঁছল।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি, বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনও বিয়ে হয়নি। কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝাই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটি? বালুরঘাটে কার মেয়ে?

—হিলি! হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার! স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে।

—ওরে, নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পানের কৌটোটা কোথায়? দেখ দেখ, বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে। ব'স্ না চুপ করে, গাড়ী দেখবি তো ইষ্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই, তিন, চার—গাড়ীর ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আলাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে, ওই লাল সুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি,—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজেই সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্ব্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পৌছল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে ভাটিখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়ায় নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু মাইল তফাৎ দিয়ে রাঙাপাড়া রোড দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জ্জন জায়গা। দূরে অত্যুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মত দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্য্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ও-কাজ তার পোষায়ও না, সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ী গিয়েছে দু দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হোল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসত।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে—ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমার নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু দিন, তাড়াতাড়ি যা—। কোন কেস ছিল এ কদিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্ব্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অল্প কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে!

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু সিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

সুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে কিন্তু সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র? শাড়ী কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ-বেরঙের শাড়ী, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি; এ ছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রিম, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, কাউন্টেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না চিরুনি, আরও কত কি। সর্ব্বনাশ!—কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হোল, তার বোন কমলার সুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—? কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ী ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন জায়গায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স; কমলা বাড়ী বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছ-কয়েক সরু সোনার চুড়ি; নতুন-ওঠা কাঁচের চুড়িও দু গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসানো, কাজ-করা। একটা মনিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলী সুটকেস। পুরুষের নাম-গন্ধ নেই সুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। সুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হোল? ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে? মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনও মেয়ে তো ছিল না; পার্ব্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল; তাদের মধ্যে এ সুটকেস কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের সুটকেস।

আচ্ছা, মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে, তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?—তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে-কোনও মেয়ের সুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিচ্ছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেঁয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? দাশিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলি-সুরে প্রতুল কখনও কামায়ে না,

দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মত হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়েনি। কি এখন সে কি করে?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই সুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ী আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায়!

শাড়ী বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ী যা আছে সব জরিপাড়। আর তাঁতের দামী শাড়ী শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ী যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ী আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে, কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড শান্তিপুরী শাড়ী? আর সাদা ব্লাউজ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ী পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্ত্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজার সাহেবকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হোল না। রঙিন শাড়ী পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর ছিয়ার অলরেডি! থট ইউ ওন্‌ট বি ছিয়ার বিফোর টু-মরো।

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'জ অ্যামিস?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ! ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাঁসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্য্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে,—সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার সুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মনিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হোল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

—ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালে। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স এই পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে —না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিশি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তার রোমান্স!

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে সুটকেস বদল হোল? বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারও সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওর সেই বইখানা 'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স্' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়ল সুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে সুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসল।

চিঠি খান-পনের। একজনেরই হাতের, বেশ গোথিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, C/o সি. আর. পাল, ২২৬ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ী নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই সুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো সুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্চ্ছা যাবে! দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই সুটকেসের মধ্যে। তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়েটির কোন উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ। শেষ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার সুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সে সুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। সুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটা তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জ্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অন্তত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের সুটকেসটি কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিসে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্যবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার সুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার সুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনসিওর্ড আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার সুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত
শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি, তা কিছুই বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী এসে জুটল মাঝখানে! তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে সুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের সুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও ডালের পাটালি পর্য্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা মনে জাগে বই কি! বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জ্জন জীবনে। তা ছাড়া, কোন্ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ী রওনা হোল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালবাসে। কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলেছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজেদের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ী যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হোল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্ম্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে সুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে সুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা সুটকেস।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কণ্ডাকটরকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ী থেকে কোনও লোক আসেনি?

কণ্ডাকটর বললে—ডিপুটি সাব? নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা।

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে,

অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরও বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্য্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ যখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর সুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্ত্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জ্জন বাংলোতে—এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীদের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সিটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির? সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হঠাৎ মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে,—আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরন ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে নর্থ বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব? তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠল প্রায়। বললে,—কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পৌঁছে দেব বাড়ী, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে গেল। কিন্তু মুখে বললে,—আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাট নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়ীতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।…অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার সুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য্য, আমিই ভাটিখালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও! আপনি প্রতুলবাবু! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

—সেবারে বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন —না?

প্রতুল হেসে বললে,—হ্যাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স-বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ? আমার দোষ, যতই তাতাতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

—স্কটিশ চার্চ্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি-এ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু? মামার বাড়ী থাকেন বুঝি?

—না, মামার বাড়ী ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ী করি?

মেয়েটি বললে—গাড়ী করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হোল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেতে চাইলে—সে কথাতে তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স-বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ীর মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এসে তাকে বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো। আপনি অতি মহৎ লোক। এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরমাত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ীর মধ্যে ওর কাকীমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন।

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি-একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বস্ একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই, অনেক দিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহুদিন থেকে। আই-এ-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি-এ পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম-এ পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্ব্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে

প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ীর মধ্যে বলেছে এ-বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও-বেলা ধীরে-সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম. বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা-জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসার, বাপ-মা-মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব, এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়ার্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স-বদল করবে? অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, ব'লো না! কি কষ্ট সেদিন আমার! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙি, শার্ট! মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝি নে। বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক। কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার! আর বাক্স-বদল হোল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে! বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে, গুড়, পুরনো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো!

প্রতুল বললে—হায় হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে!

মুলো—র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ

নবীনবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া কয়লা চাকরকে ডাকাডাকি করিতেছেন শুনিতে পাইয়াও আবার চাদর মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া এবং তার একটু পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াও পড়িয়াছি। জানালার ফাঁক দিয়া পাশের আতাগাছের ডাল যখন দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি রোদের মধ্যে ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তখন কয়লার ডাকে তন্দ্রা ভাঙিল।

—বাবুজি, চা তৈয়ার!

—চা? এখানে নিয়ে আয়, বিছানায়।

নবীনবাবু বোধ হয় প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া আমার ঘরের পাশের সরু করিডোর দিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমার আলস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বেশ জোরে জোরে পা ফেলিয়া গেলেন। চা-পান বিছানায় বসিয়াই শেষ করিয়া উঠিব-উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার বিছানার পাশের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উঠুন মশাই, ঘোষপুরী মুলো এসেছে, র‍্যাডিশ।

আমি চটি পায়ে দিতে দিতে বলিলাম—হর্স র‍্যাডিশ? একা, না মিস সোরাবজিকে নিয়ে?

নবীনবাবু রাগ করিয়া বলিলেন—আসুন না, উঠেই আসুন না। মিস সোরাবজির বাবা-

মার দায় পড়েছে ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সকাল বেলা। একাই এসেছে।

পরে পিছন ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা, রোজ রোজ কেন সকালে এসে জোটে বলুন তো? কি কাজ এখানে বাপু তোর? বিরক্ত করলে! আর আপনিও আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না একদিনও—

বলিলাম—আপনার উক্তি দুটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটা কি ভাল বুঝলাম না নবীনদা—

—বুঝবেন বুঝবেন—শীগগিরই বুঝবেন। যদি সকালে সকালে বেরিয়ে যাই, তাহলে তো আর এ হাঙ্গামা এসে জোটে না সকালবেলা। এখন চা কর রে, খাওয়াও রে, ভাজ ভাজ করে বকো রে—

—নবীনবাবু, শিওরলি ইউ ডোণ্ট গ্রাজ ইওর গেস্ট এ কাপ অব টি!

—থাক থাক হয়েছে—গেস্ট! ভারি আমার গেস্ট রে!

যাহার অভ্যর্থনার আয়োজন এত হৃদ্যতাপূর্ণ, সে বেচারী নির্বিকার ভাবে হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমায় দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া পরম বন্ধুত্বের সুরে বলিল—গুডমর্নিং মিস্টার রায়!

আমি হাত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে পরিপূর্ণ অমায়িকতার সঙ্গে বলিলাম—গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম মিঃ শুকরাম—গুডমর্নিং।

নবীনবাবু উদাসীনভাবে অতিথির করমর্দন করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, বসুন মিঃ শুকরাম। আমি একবার জেনারেল পোস্টাপিস থেকে একটা তার করে আসি, আপনি ততক্ষণ চা খান।

আমার দিকে চাহিয়া বাংলায় বলিলেন—মূলোকে শীগ্‌গির ভাগাবার চেষ্টা করুন। আজ এখুনি আমাদের বেরুতে হবে, কাজ আছে অনেক।

মূলো যাহাকে বলা হইয়াছে সে বাংলার একবর্ণও বোঝে না তাই রক্ষা। আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ইংরেজিতেই হয়।

মূলো জাঁকিয়া বসিয়া আমায় বলিল—বাঙালীদের মত লুচি কবে খাওয়াচ্ছেন মিঃ রায়? ও আমার বড় ভাল লাগে। আমি বাঙালীদের সঙ্গে একবার মিশেছিলাম—লুচি খাইয়েছিল। সে এখনও ভুলিনি।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম—নবীনদার পিত্তি জ্বলে যেত—যদি কথাটা শুনত। ভাগ্যিস নেই এখানে। যে অভ্যর্থনার ঘটা তাঁর! কয়লা চাকরকে ডাকিয়া খানকতক লুচি ভাজিতে বলিতে গিয়া শুনিলাম ঘি ও ময়দা বাজার হইতে না আনিলে চলিবে না, ফুরাইয়া গিয়াছে! বুঝিলাম অতিথির অদৃষ্টে লুচি নাই। নবীনবাবু হয়তো ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারেন। দরকার নাই সেসব হাঙ্গামায়। চা ও টোস্ট খাওয়াইয়া দিলাম মূলোকে। মূলো তাহার স্বভাব-সিদ্ধভাবে বকিতে শুরু করিয়া দিল। বকুনি আর থামায় না, বেলা নটা বাজিয়া গেল, তবুও তাহার হুঁশ নাই। ইতিমধ্যে নবীনবাবু আসিয়া পড়িলেন, মূলোকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আমায় বলিলেন—মূলোটা এখনও যায়নি? হর্স র‍্যাডিশটা?

—না গেলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে! ও বলছে আমাদের সঙ্গে খিন্‌সি লেক দেখতে যাবে।

—মাটি করেছে! সারলে দেখছি।

মূলো আমাদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মিঃ রায় খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে কি বলছেন?

নবীনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে—খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করছি ওর সঙ্গে। আপনি আসবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?

—নিশ্চয় মিঃ বোস, খুব খুশীর সঙ্গে।

—বেশ বেশ। বড় আনন্দ হোল। বড় খুশী হোলাম।

আমি বলিলাম—মিঃ শুকরামের মত সঙ্গী পেলে খিন্‌সি তো খিন্‌সি, উত্তর মেরুতে গিয়েও সুখ আছে।

নবীনবাবু ইংরেজিতে সায়সূচক কথা বলিয়া আমায় বাংলাতে বলিলেন—স্বর্গেও যদি যাও মূলোকে নিয়ে স্বর্গের হাওয়া পর্য্যন্ত তেতো হয়ে উঠবে, ওকে ভাগাবার চেষ্টা কর।

মূলো বলিল—তাহলে কখন রওনা হব আমরা, মিঃ বোস?

—রওনা? সে তো এখনও ঠিক হয়নি, দেখি—

—যদি বলেন আমার এক জানাশুনো গাড়ী আছে—পেট্রোলের খরচটা দিলেই রাজী হয়ে যাবে। বলব তাকে?

—বলুন না, বেশ বেশ!

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

পরদিন মূলোর চেষ্টাতে গাড়ীর যোগাড় হইয়া গেল। আহারাদি সারিয়া আমরা তিনজনে শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী খিন্‌সি হ্রদ দেখিতে রওনা হইলাম। নাগপুর জব্বলপুর রোডের যে স্থান হইতে খিন্‌সি হ্রদের রাস্তা বাহির হইল, ঠিক সেই জায়গাটিতে পড়ে মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি।

মূলো আমাদের সঙ্গে আসিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ বকুনি শুরু করিয়াছে। নবীনবাবু বাংলায় বলিলেন—মূলোটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে হে! ওকে এই ম্যাঙ্গানিজের মাইনে রেখে গেলে কেমন হয়?

মূলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার সব বাংলা কথার মানে জানা চাই।

নবীনবাবু উত্তর দিলেন—এই ম্যাঙ্গানিজ খনিটা ইণ্ডিয়ার মধ্যে একটা বড খনি তাই বলছি।

নাগপুরে আমরা দুজনে আসিয়াছি বেড়াইতেও বটে, কিছু ইনসিওরের আসামী যোগাড় করিতেও বটে। সিভিল লাইনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলো ভাড়া লইয়া যেদিনটা

বারান্দায় ক্যানভাসের আরাম-কেদারা পাতিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছি—সেদিন এবং সেই মুহূর্তে এই লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে। একটি তরুণ যুবককে বাড়ীর হাতায় ঢুকিতে দেখিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলাম এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চান ?

যুবকটির চেহারা একহারা, দাঁত উঁচু, শ্যামবর্ণ, মুখে দুই একটা বসন্তের দাগ, ছোট ছোট চোখ, পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। সে একগাল হাসিয়া বলিল—আপনারা এই বাসা ভাড়া নিয়েছেন ? বাঙালী ? সে আমি দেখেই বুঝেছি। সেইজন্যেই এলাম—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকে আছে।

বলিলাম—আসুন বসুন। এইখানেই বাড়ী বুঝি ?

যুবক পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—দেশ আমার যোধপুর। এখানে কলেজে পড়ি—ফোর্থ ইয়ারে।

—বেশ বেশ। একটু চা খান—

সেই হইতে ইহার যাতায়াত শুরু। এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন ছোকরা দুবেলা আসে নাই এবং নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করে নাই। দিন কয়েক পরেই নবীন-বাবু এবং আমি আবিষ্কার করিলাম যে ছোকরা কিছু স্থূলবুদ্ধি, ঠিক সকালে ও বিকেলে চা পানের আগে আসিয়া জুটিবে এবং দুপুর পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু বকিবে—উঠিবার নামটি করিবে না। বাধ্য হইয়া প্রায়ই দুপুরে বা রাত্রে—কোন কোন দিন দুবেলাই তাহাকে খাইতে বলিতে হইয়াছে। সে খাইয়াছেও। এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে না।

হয়তো নবীনবাবু বলিলেন—মিঃ শুকরাম (তাহার নাম রত্নাকর শুকরাম জৈন), ওবেলা আমরা একটু হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাব, বিকেলটাতে থাকব না।

—বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যের পর আসব।

—ও, তা বেশ। তবে বোধ হয় ফিরতে একটু দেরিই হবে।

—না হয় আমি একটু রাত করেই আসব এখন। আপনারা অনেক উঁচু বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন—আমার শুনতে বড় ভাল লাগে। এই জন্যেই আমি বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে বড় ভালবাসি। তা এখানে বাঙালী বেশি নেই—যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় মেশেন না।

এই ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার দরুন আমরা তাহাকে 'মূলো' আখ্যা দিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে বাংলায় তাহাকে 'মূলো' বলিয়া উল্লেখ করিতাম। কখনও কখনও 'মূলো'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া তাহার সামনেই তাহাকে 'র‍্যাডিশ', কখনও 'হর্স র‍্যাডিশ' বলিতাম। বেচারা আমাদের বাংলা কথার অর্থ একবর্ণও বুঝিত না। 'মূলো' কথার ইডিয়মগত অর্থই বা বুঝিবে কিরূপে। মাঝে মাঝে আমাদের মুখে 'র‍্যাডিশ', 'হর্স র‍্যাডিশ' শুনিয়াও কিছু না বুঝিয়া হয়তো ভাবিত—ইহারা এ তিনটা কথা এত ব্যবহার করে কেন ?

আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বটে, কিন্তু 'মুলো'র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিশেষ নয়, একজন ভাল বাঙালী ম্যাট্রিক ছাত্র তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু জানে। বলা বাহুল্য অবাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বভাবত খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়? রামোঃ, এখানে মানুষ আছে কে?

আমাদের এই মনোভাবের পটভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মুলোর ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের যে দুর্দশা এরূপ দাঁড়াইবে আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে ইহা আর বেশি কথা কি!

মজার ব্যাপার এই, যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার সে কিছুই বুঝিত না। বরং ভাবিত, আমাদের মত অমায়িক বাঙালী ভদ্রলোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে লাভবান হইয়াছে। এজন্য সে মাঝে মাঝে গর্ব্বও করিত।

মুলোর মুখে শুনিয়াছিলাম ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। গাড়ী জব্বলপুর রোডের উপর খনির সামনে দাঁড়াইতেই সে দোর খুলিয়া ছুটিয়া গেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। যেন আমরা লাট সাহেব আসিয়াছি মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি দর্শন করিতে—এমনভাবে সে হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি মিঃ বোস, ইনি মিঃ রায়—বাঙালী, খুব পণ্ডিত লোক এঁরা দুজনেই। আমার বিশেষ বন্ধু।—কি মুশকিল! পাণ্ডিত্যের মধ্যে তো আমরা করি ইন্‌সিওরেন্সের দালালি! অবশ্য আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও পুরাতত্ত্বের ওপর কিছু ঝোঁক আছে—কিন্তু সে ফটোগ্রাফির দিক হইতে, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিক হইতে নয়।

মুলোর কাণ্ড দেখিয়া আমরা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ম্যানেজার নাগপুরের লোক, ছিন্দওয়ারা জেলার অধিবাসী, বেশ ইংরেজি বলে। জব্বলপুর রোডে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমরা প্রায় দু শ ফুট চড়াই ভাঙিয়া খনির মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। একটা ক্ষুদ্র ডন্‌কি এঞ্জিনে খাদের জল তুলিয়া লম্বা রবার ও তারের নল দিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—সেটা দেখিয়া আমরা সকলে খুশী হইলাম।

ম্যানেজার আমাদের চা পান করিতে বলিলে আমরা অস্বীকার করিয়া আবার নীচে নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। ম্যানেজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম, কষ্ট করিয়া আমাদের সব দেখাইবার জন্য। গাড়ী পুনরায় চলিল।

নবীনদা কহিলেন—মুলো বড্ড গণ্ডগোল করে। আমাদের নিয়ে এমন করছিল···!

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার আবার সকল কথারই মানে জানা চাই।

নবীনদা বলিলেন,—চমৎকার খনিটা, তাই বলছিলাম।

—ও, তা র‍্যাডিশের কথা কি বলছিলেন? এখানে তো র‍্যাডিশ পাওয়া যায় না!

আমরা দুজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নবীনদা বলিলেন,—ওটা একটা বাংলা ইডিয়ম মিঃ গুকরাম। ভাল জিনিসকে বাংলায় আমরা মূলো বলি।

—তাই নাকি? হাউ ইন্টারেস্টিং!

আমি বাংলায় বলিলাম,—তোমার মুণ্ডু—বোকারাম কোথাকার!

নবীনদা বলিলেন,—মূলো আর সাধে বলে! একেবারে হর্স র‍্যাডিশ!

রামটেকের পাহাড় বাঁদিকে রাখিয়া কিছু দূর গিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের নিবিড় ছায়াভরা বীথিপথে চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া মোটর অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতেছে। শরৎ-অপরাহ্নের অপূর্ব শোভা বনতলে। কোথায় যেন পাকা আতার গন্ধ, দু-একটা বনফুলের সুবাসের সঙ্গে যেন শেফালীর পরিচিত সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসের ঝাপ্‌টায়। এমন শোভার মধ্যে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্ত ইন্‌সিওরেন্সের দালালি বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

খিন্‌সি হ্রদে উঠিবার সময় পাহাড়ের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেক দূর উঠিয়া গেলে শৈলবেষ্টিত হ্রদের শান্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের শৈলসানু ঘন বনে সমাকীর্ণ, স্থানটা নিতান্ত নির্জন। একদিকে অপরাহ্নের ছায়া, অপর পারের পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙের রোদ্র। হ্রদের এপারের ডাকবাংলোয় গিয়া আমরা চৌকিদারকে ডাকিয়া চেয়ার বাহির করাইয়া বসিলাম। চৌকিদার আমাদের নির্দেশমত চায়ের জল চড়াইতে ছুটিল।

নবীনদা ও আমি হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্ত নামিলাম। বনের মধ্যকার সরু পথ ধরিয়া ধরিয়া কতদূর নামিয়া গেলাম দুজনে। মূলো এসব ভালবাসে না, সে ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসিয়াই রহিল। জলের উপরে বুনো শিউলি ফুলের রাশি সকালের রোদে ঝরিয়া পড়িয়াছে—দু তিন দিনের জমানো ফুলের রাশ। আমরা জলের ঢেউ দিয়া একপাশে সরাইয়া স্নান করিলাম।

নবীনদা বলিলেন,—বাঘ নেই তো? বড্ড জঙ্গল চারিধারে—

—আশ্চর্য্য নয় কিছু।

—মূলোটাকে বাঘে না নিয়ে যায়। একা বসে আছে—

—কেন, ড্রাইভার?

—ও চৌকিদারের সঙ্গে গিয়েছে। বলে গেল ফিরতে আধঘণ্টা দেরি হবে, দুধ আনতে গেল।—ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া দেখি মূলো নির্বিকারচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। নাগপুর হইতে আনা বম্বে ক্রনিক্‌ল্, আগের তারিখের। আমাদের দেখিয়া বলিল—আমেদাবাদের দুটো মিলে স্ট্রাইক হয়েছে বড় জোর—

নবীনদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মূলোর কাণ্ড শোন—এমন একটা জায়গায় এসে ওর এখন আমেদাবাদের মিলের কথা বড্ড দরকারী হোল!

কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করিতে বলিল। পাহাড়ের পথ, তাহার গাড়ীর আলোটা ভাল নাই—আমরা দেরি করিলে শেষে মুশকিলে পড়িতে হইবে।

মূলো বলিল—চলুন মিঃ বোস। আজ যাওয়া যাক, আর কি দেখবেন, দেখা তো হয়ে গেল—

নবীনদা বলিলেন—তোর মুণ্ডু হোল—হতভাগা হর্স র‍্যাডিশ!

মূলো বলিল—কি?

—মানে, আমাদের এখন যাওয়াই দরকার তাই বলছি।

—হোয়াট হ্যাজ হর্স র‍্যাডিশ টু ডু উইথ ইট?

—বাংলা ইডিয়ম—ওর মানে মূলো খেতে যেমন ঝাল, অথচ দেখতে রাঙা তেমনি এ জায়গা যতই ভাল হোক—মানে—এই গিয়ে—

আমি নবীনদার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—ঠাণ্ডা লাগতে পারে তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত—বাংলা ইডিয়ম। মূলো হাসিতে লাগিল। বলিল—ফানি, দ্যাট র‍্যাডিশ ইজ অলওয়েজ মিক্সড্ উইথ ইওর বেঙ্গলি ইডিয়ম্স্।

থিন্‌সি হ্রদের পাহাড় হইতে নামিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের কুসুমাস্তৃত পথে আমরা রামটেক পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছিলাম। নবীনদার আদেশে ড্রাইভার নাগপুরের রাস্তা ছাড়িয়া বন্য আতাবৃক্ষ শোভিত রামটেক পাহাড়ের ঘোরানো পথ ধরিল। মূলোর এ জিনিসটা মনঃপূত হইল না। সে দু একবার মৃদু প্রতিবাদও করিল, বিশেষ কোনও ফল হইল না। আসল কথাটা আমরা জানিতাম। মিস সোরাবজি নামে একটি পার্শী তরুণীর সঙ্গে মূলো ভাব জমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে আজ মাস ছ সাত ধরিয়া। মেয়েটির বাবা নাগপুরের ডাক্তার, তাহাদের বাড়ী সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো মূলোর অনেক দিনের অভ্যাস, যদিও মেয়ের বাপ-মা তাহা যে খুব পছন্দ করে তাহা নয়। মূলোর মুখে শুনিয়াই বুঝিয়াছি তাঁহারা মূলোকে এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, এত ঘন ঘন সে যেন তাঁহাদের বাড়ী না আসে। কিন্তু মূলোর বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির স্থূল আবরণ তাঁহারা ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

পাহাড়ের নীচে গাড়ী রাখিয়া আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরিস্থিত রামসীতার মন্দিরে উঠিতেছি।

মূলো বলিল,—মিঃ রায়, একদিন মিস সোরাবজি বলেছিল রামটেকের মন্দির দেখবে, বড় ভাল হোত যদি আজ আনতাম।

নবীনদা আমার গা টিপিলেন। আমার হাসি পাইতেছিল, অতি কষ্টে চাপিলাম।

পাথরে বাঁধানো অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির দু ধারে অসংখ্য বন্য আতা, পড়াসি ও তিন্দুক গাছের নিবিড় বন। ডান দিকে অনাবৃত পর্ব্বতগাত্র হেলিয়া থাকিয়া দৈত্যপুরীর মাইলস্টোনের মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ামাখা নিস্তব্ধতার মধ্যে পেশোয়াদের নির্ম্মিত এই শৈলমন্দির দুর্গটি ভারতের অতীত গৌরবের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছিল আমাদের কানে কানে। শুধু সে গাম্ভীর্য্যময় নিস্তব্ধতার অপোভঙ্গ হইতেছিল মূলোর অসম্ভব বকুনি দ্বারা। উপরে উঠিয়া আমরা বিগ্রহ দর্শন করিলাম। সামান্য কিছু প্রসাদ ও চরণামৃত পাইলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর মন্দির, অনেক নীচে একদিকে রামটেকের বাজার।

মূলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইত, যদি সে এখানে আসিয়া মিস সোরাবজি সম্বন্ধে কিছু বলিত—আমরা ভাবিতাম লোকটার প্রাণে তবুও কবিত্ব আছে। কিন্তু মন্দির-দুর্গের চওড়া প্রাচীরের উপর বসিয়া আমরা যখন দূরের জ্যোৎস্নালোকিত খিন্‌সি হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, মন্দিরে প্রাচীন মারাঠী পুরোহিত রামসীতার আরতি করিতেছেন, পেশোয়াদের আমলের প্রথানুযায়ী আরতির সময় গম্ভীর নির্ঘোষে রণবাদ্য দামামা ও ডগর বাজিতেছে, ঐদিকে বহুদূরে কাম্‌টি ক্যান্টনমেণ্টের ক্ষীণ সারি, তখন যদি সে তাহার প্রণয়িনীর কথা তুলিত—আমরা ভাবিতাম এই রামগিরি আশ্রমে জনকতনয়ার স্নান হেতু পুণ্যোদকের স্পর্শে হর্স র‍্যাডিশ বুঝি কালিদাসের বিরহী যক্ষের দশা পাইয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়, সে মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়া দিল—দেশের এক মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে সে কি করিয়া ভোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে নামিল তাহাদের দেশে কি করিয়া 'ফুটেরি' তৈরি করে। আমরা কহিলাম—ফুটেরি কি?

মূলো হাত দিয়া গোলাকার জিনিস দেখাইবার ইঙ্গিতে বলিল—এই এত বড় বড়, আটার তৈরি, ভেতরে ছাতু। ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ঘি দিয়ে খায়, আলুর চোখা আর বেগুনের ভর্তার সঙ্গে।

নবীনদা বলিলেন—মূলোর সঙ্গে নয়?

—নো, র‍্যাডিশ ইজ নট ইটন্—

—আশ্চর্য্য!

—হোয়াই আশ্চর্য্য? র‍্যাডিশ ইজ মাচ রেলিশ্‌ড্ ইন বেঙ্গল ইট সিম্‌স্—বাট নট সো ইন আওয়ার কাণ্ট্রি।

—বুঝলাম।

—আচ্ছা, এই দুর্গের পাঁচিলটা এত চওড়া কেন?

মূলোর স্থূল বুদ্ধিতে আর কতটুকু বোঝা সম্ভব? তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পেশোয়াদের সময়ে এই মন্দিরটি দুর্গের মত করিয়াই তৈরি হয়—আসিবার পথে অতগুলি ফটক দেখিয়া তাহা সে নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করিয়াছে। পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ এই মন্দির-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এখানে একটি গুপ্ত ধনাগার স্থাপন করেন। আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে নাগপুর হইতে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এই অরণ্যাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় রামসীতার মন্দিরে তাঁহার ধনভাণ্ডার অনেকটা নিরাপদ থাকিবার ভরসাতেই এটি নির্ম্মিত হয়। বিশেষত তখনকার যুগে না ছিল রেল, না ছিল এখনকার দিনের মত চওড়া মোটর রোড। রামটেকের পাহাড় ছিল দুর্গম অরণ্যভূমির অন্তরালে—শত্রু সন্দেহ করিবে না যে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কোন্ পাহাড়ে রাম-সীতার মন্দির—সেখানে আবার ধনভাণ্ডার থাকিতে পারে। তবুও সাবধানের মার নাই ভাবিয়া বালাজি বিশ্বনাথ মন্দিরটিকে দুর্গের মত করিয়াই নির্ম্মাণ করেন—মন্দিরকে মন্দির, দুর্গকে দুর্গ। আবশ্যক হইলে কিছুকাল ধরিয়া এখানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাও চলিতে পারিত। জলের অভাব দূর করিবার জন্য পাহাড়ের নীচে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়—আসিবার সময় যে

পুকুরটা ডান দিকে পড়িয়াছিল। মূলো আমার মুখে রামটেকের মন্দিরের ইতিহাস শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আপনি এসব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন দেখছি, বহুৎ পড়াশুনো করেছেন। এইজন্যেই তো বাঙালীদের আমি বড় ভালবাসি—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করলে আমার মন বড় খুশী হয়।

মন্দিরের আরতি থামিয়াছিল। আমি বলিলাম—এখানে একটা অস্ত্রাগার আছে বইয়ে পড়েছি—চলুন সেটা দেখে আসি সবাই, এখনও আছে বলে জানি।

মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রংড়ে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলিলেন, রাত্রে অস্ত্রাগার দেখানোর নিয়ম নাই—অবশেষে আমাদের নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া, বিগ্রহ যেখানে থাকেন তাহার পাশের একটা কুঠুরি খুলিয়া দিলেন। আমরা টর্চ্চের আলোয় সেখানে মারাঠী যোদ্ধাদের প্রকাণ্ড চওড়া দুধার তলোয়ার, সাতহাত লম্বা বন্দুক, বিশাল ঢাল, লোহার জালের টুপি ও বর্ম্ম, নানা রকমের তীর, আরও কত কি অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম। যোদ্ধজাতির যুদ্ধের উপকরণ পাঁচরকম থাকিবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। প্রশংসার ভাব মনে জাগিত হয়তো, যদি বর্গির হাঙ্গামার কথা মনে না উঠিত।

মূলো বলিল—এ আর কি, যোধপুর ওল্ড ফোর্টে একটা মিউজিয়াম আছে, সে এর চেয়ে অনেক বড়।

কোন কিছু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা—এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, মূলোর মধ্যে তাহা থাকিবার আশা করি নাই; সুতরাং বিস্মিত হইলাম না।

নবীনদা বলিলেন—আপনাদের দেশে যোধপুরে একবার নিয়ে যাবেন আমাদের? অস্ত্রাগার দেখে আসব।

—নিশ্চয়ই। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের নিজ বাড়ীতেই একটি অস্ত্রাগার আছে, আমার পূর্ব্ব-পুরুষের আমলের।

—বলেন কি মিঃ শুকরাম!

—হাঁ। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আওরঙজেবের আমলের লোক! তাঁর নাম—আচ্ছা নোটবুক দেখে বলব। আমরা হলাম ডোগরা রাজপুত—ওয়ারিয়ার ক্লান ডোগরা রাজপুত জানেন তো? আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষ, তিনি লড়েছিলেন জয়সিংহের সৈন্যদলে। এখনও অস্ত্রাগারের পূজো হয় আমাদের বাড়ী। ধূপধুনো জ্বালাতে হয়, সিঁদুর মাখাতে হয়—

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—সাবাস মূলো! ডোগরা রাজপুত হয়ে মরতে এসেছ কেন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে? ও কি তোমার হবে?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া, মূলোর দুকূলই গিয়েছে। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়ারও বুদ্ধি নেই—একে বলে হর্স র‍্যাডিশ।

মূলো বলিল—কি?

নবীনদা বলিলেন—কি রকম বড় বংশে জন্ম আপনার তাই বলছি—ডোগরা রাজপুত যোদ্ধা জাত কিনা!

মূলো বলিল—যাক, মিঃ বোস, একটু চা খাওয়ার যোগাড় হয় না? চা না খেলে আর তো চলে না।

মন্দির হইতে নামিয়া রামটেকের বাজারে চায়ের দোকানে চা পান করিয়া নাগপুরে ফিরিলাম। এত ভাল ভাল জিনিস যে সারাদিন ধরিয়া দেখিলাম, মূলো সেসব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। তাহার যতসব বাজে গল্প আর অনবরত বকুনির জন্ম আমরা নিজেদের মধ্যেও কিছু আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না।

পরদিন সকালবেলা মূলো আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনাদের ওবেলা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায়?

—মিস সোরাবজির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আমরা কেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন ওঁর বাবা।

আমরা বিকালে সাজগোজ করিয়া বসিয়া আছি, মূলো আর কিছুতেই আসে না। নবীনবাবু বলিলেন,—ওহে, মূলোটার মতলব শুনে আমাদের হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখছি। ও এল না।

এমন সময় মূলো আসিয়া হাজির হইল—সে নিখুঁত সাজপোশাক করিয়া কোটের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রুমালে এসেন্স ঢালিয়া আসিয়াছে এবং বোঝা গেল যে সে কিছু পূর্ব্বে নাপিতের দোকান হইতে চুলও কাটিয়া আসিয়াছে।

মিস সোরাবজির পিতা এখানকার ডাক্তার। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল—বৃদ্ধ অতি অমায়িক লোক। দেখিলাম তিনি শুধু আমাদের তিনজনকে চা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা নহে, শহরের আরও আট-দশটি ভদ্রলোককে বলিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসব চা-পার্টির আসল কারণ।

মিস সোরাবজি আঠার-উনিশ বছরের একহারা মেয়ে, আমরা তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। খাঁড়ার মত উঁচু সূচাল নাকের জন্ম কোনদিনই মিস সোরাবজিকে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া আমার মনে হয় নাই—যদিও রং বেশ ফরসা ও গলার সুর কণ্ঠকৃত মেমসাহেবিয়ানার দোষমুক্ত না হইলেও মন্দ নয়। মেয়েটি নাকি লেখাপড়াতে ভাল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম আমরা দুজনেই। মিস সোরাবজি মূলোর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট—অন্তত হাবভাবে আমাদের তাহাই মনে হইল। বাহিরের বারান্দায় দুজনে নির্জ্জনে মাঝে মাঝে যাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। মূলোর এতটুকু ইচ্ছাও যেন মিস সোরাবজি তখনই পূর্ণ করিতে ব্যগ্র। অতিথির প্রতি যতটুকু কর্ত্তব্য করা উচিত শেষ করিয়া মেয়েটি মূলোকে

লইয়া সব সময় ব্যস্ত রহিল।

চা-পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মূলো কি আমাদের ছাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আসিল!

কিন্তু তাহার যা স্বভাব,—মিস সোরাবজি সম্বন্ধে একবারও একটি কথাও বলিল না। চা-পার্টির-কথাই যেন তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে এটুকু সময়ের মধ্যে।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা! কলেজের বেশ ভাল মেয়ে বলে শুনেছি—র‍্যাডিশটার মধ্যে কি পেলে খুঁজে!

দু দিন মূলো কি জানি কেন আমাদের বাংলোতে আসিল না। তৃতীয় দিন সকালবেলা একখানা মোটরগাড়ী বাসার সামনে দাঁড়াইতেই আমি আগাইয়া গেলাম—নবীনদা তখন বাসায় নাই। মোটর হইতে নামিলেন ডাঃ সোরাবজি। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—শুকরাম কি এখানে এসেছিল? একটা জরুরী কথা আছে। আপনারা ওকে কতদিন জানেন?

—খুব বেশি দিন নয়। কেন বলুন তো?

—ও আমার কাছে কিছু বলে না। কিন্তু আমার মেয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। আমি ওকে বাড়ী ঢুকতে দেব না। ওকে আপনারা বারণ করে দেবেন।

মূলোর হইয়া ওকালতি করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ওকে কি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন না?

ডাক্তার সোরাবজি রাগের সঙ্গে বলিলেন, ও একটা লোফার—ওর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে কেন? ওরা হল ডোগরা—আমি আর্মিতে ছিলাম, ওরা সেখানে সাধারণ সেপাই-এর কাজ করে। সুবাদার হতে কাউকে দেখিনি। কেন জানেন?

বলিলাম—কি?

—খুব সাহস আছে, যা বলবেন তাই করবে—কিন্তু—

বলিয়া ডাক্তার সোরাবজি আঙুল দিয়া নিজের মাথায় দু-তিনবার টোকা দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

—তাহলে বলে দেবেন দয়া করে।

—আজ্ঞে ওটা বলা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত, বুঝতেই পারেন।

—আর্মি বললে একটু রূঢ় হয়ে যাবে।

—কিন্তু একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন—মিস সোরাবজির মনোভাব কেমন মিঃ শুকরামের ওপর, সেটা একবার—

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর মত একটা বাজে অপদার্থ লোকের হাতে মেয়ে দেব? ও কোনওকালে বি-এ পাশ করতে পারবে? কোনদিন নয়। আমার মেয়ে অনার্স ক্লাসের ছাত্রী, সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী—ওর সঙ্গে তার বিয়ে! হাসির কথা।

পরদিন সকালে মূলো আমার কাছে আসিয়া গোপনে বলিল, মিঃ রায়, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল মিঃ শুকরাম ?

—জালুর সঙ্গে বিয়ের। অবিশ্যি ওর সঙ্গেই কথা হোল—ওর বাবা এখনও জানেন না।

—খুব খুশী হলাম শুনে। তবে ডাক্তার সোরাবজিকে একবার বলুন।

—সে হয়ে যাবে। তা—বললেও হয়।

নবীনদা শুনিয়া বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—মূলোর সঙ্গে অমন একটি চমৎকার মেয়ের বিয়ে!

ইতিমধ্যে মূলোর পরীক্ষা পড়িল—সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া কিছুদিনের জন্য দেশে গেল। আমাদের বার বার অনুরোধ করিয়া গেল, আমরা যেন তাহাকে না ভুলি—চিঠি দিলে যেন উত্তর দিই।

দুই মাস কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া ডাক্তার সোরাবজি তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুনিলাম পাত্র পুণার মেডিকেল অফিসার, আই এম এস পদবীর লোক। মোটা বেতন পান।

আমরা বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া বলিলাম,—ও, আমরা জানতাম মিঃ শুকরাম—

বৃদ্ধ ডাক্তার রাগত-ভাবে বলিলেন, সে একটা লোফার, আগেই বলেছি। গেজেটটা দেখেছেন! তার নাম খুঁজে দেখবেন কোথাও নেই। আর আমার মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

আমরা সত্যই দুঃখিত হইলাম মূলোর জন্য।

এত কথার পর বিকালে যখন মূলো আসিয়া জানাইল মিস সোরাবজি ও আমাদের লইয়া সে পরদিন পিকনিকে যাইবে, তখন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। নবীনদা হাঙ্গামায় পড়ার ভয়ে প্রথমটা যাইতে চাহিলেন না—কিন্তু শেষে যখন মূলোর মুখে শুনিলাম, মিস সোরাবজির ভাইও এই সঙ্গে যোগ দিবে তখন আমাদের যাইতে কোন আপত্তি রহিল না।

গোরেওয়াড়া হ্রদের ধারে পিকনিক ঠিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে দল বাঁধিয়া দুখানা মোটরে হ্রদের ধারে গিয়া পৌছিলাম। নাগপুরের পাহাড়ের মধ্যে যতগুলি হ্রদ আছে, এটি সর্ব্বাপেক্ষা বড, দৃশ্যও চমৎকার। আমরা উত্তর পাড ধরিয়া হ্রদের ওপারে অনুচ্চ পাহাড়ের তলায় বড বড তিন্দুক গাছের ছায়াতে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। মিস সোরাবজির ভাইটির বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশি নয়, বালক মাত্র—তাহার মনে দেখিলাম খুব ফুর্ত্তি, হ্রদের জলে সাঁতার কাটিবার জন্য সে স্নানের পোশাক পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মিস সোরাবজি মেয়েটিকে ঠিক বোঝা কঠিন। এদিনও দেখিলাম মূলোর প্রতি তাহার যথেষ্ট আকর্ষণ, তাহার এতটুকু সুখ-সুবিধার জন্য মেয়েটির কি উদ্বেগ। অবশ্য আমাদের দুজনেরও সঙ্গে সে ভাল ভাবেই মিশিল। এতটুকু অহংকার নাই, বাঙালী মেয়ের মতনই সরলতা, পরের সুখ-সুবিধা দেখার অভ্যাস, নিজের হাতে সেবা করিবার ঝোঁক। সে যে বি-এ

ক্লাসের ভাল ছাত্রী, তাহার কথাবার্ত্তা হইতে এতটুকু তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আমাকে বলিল—মিঃ রায়, একটা বাংলা গান করুন না?

আমি গান গাহিতে ভালই পারিতাম। এখন চর্চ্চার অভাবে গলায় সুর নাই—সে আপত্তি বলা বাহুল্য টিকিল না, পর পর তিনটি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে হইল। বাঙালী-সলাজ নয়, বিশেষত কলিকাতা হইতে বহুদূরে, কাজেই ভুল ধরিবার কেহ নাই—বেপরোয়া হইয়া গাহিলাম। প্রশংসাও অর্জ্জন করিলাম মূলো ও মিস সোরাবজির কাছে।

মূলো বলিল—ওয়াণ্ডারফুল। এমন গান যে আপনি গাইতে পারেন, তা জানতাম না বাস্তবিক।

মিস সোরাবজি বলিল—টাগোরের কবিতা মুখস্থ আছে।

—দু-একটা—

—আবৃত্তি করুন না! আমাদের কলেজে মিঃ সেনের মেয়ে একবার করেছিল, বড় ভাল লেগেছিল আমার।

'জীবনদেবতা' কবিতাটি মুখস্থ ছিল ভাল, আমার মুখে শুনিয়া মিস সোরাবজি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—ভারি সুন্দর!

তাহার পর সে তাহার শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া আবদারের সুরে বলিল—মিঃ রায়, আর একটা আবৃত্তি করবেন দয়া করে?

—আগে আপনি একটা ইংরেজি আবৃত্তি করুন!

—করবেন তাহলে?

মিস সোরাবজির খড়্গের মত সূক্ষ্ম ও উগ্র নাসিকাকে ক্ষমা করিলাম, মেয়েটি অত্যন্ত চালবিহীন ও অমায়িক, তখনই সে ব্রাউনিঙের 'বৈয়াকরণের শবযাত্রা' নামে বিখ্যাত কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিল।

পুনরায় আমাকে একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। এবার হাত-মুখ নাড়িয়া শিশির ভাদুড়ীর অনুকরণে 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিয়া ইংরেজিতে ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলাম। পূর্ব্বের কবিতাটি অপেক্ষা এইটিই মিস সোরাবজির বেশি ভাল লাগিয়াছে, তাহা তাহার কথার সুরে ও চোখ-মুখের ভাবে আমার বুঝিতে দেরি হইল না। আমায় বলিল—দেখুন রায়, টাগোরের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনি আর ঝংকারের মধ্য দিয়ে যে ওসব কবিতা এমন চমৎকার শোনায়, তা আমি আজ এই প্রথম জানলাম। এর আগে একবার বাংলা আবৃত্তি শুনেছিলাম কলেজে, সে তেমন কিছু নয়। আমার বাংলা শেখার বড় ইচ্ছে, কি করে শেখা যায় বলতে পারেন?

মূলো দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছে—কবিতা শুনিয়া নয়, কারণ সে সূক্ষ্ম রসবোধ তাহার ছিল না—বাংলা কবিতা ও প্রকারান্তরে বাঙালীর প্রশংসা করা হইতেছে, এইজন্য। লোকটা অন্ধ বাঙালীভক্ত।

বলিল—জানু, তুমি মিঃ রায়ের কাছে কেন বাংলা শেখ না? বেশ ভাল হবে—

মিস সোরাবজি পুনরায় আবদারের ভঙ্গিতে তাহার সুঠাম শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া বলিল—শেখাবেন আমাকে মিঃ রায় ? আমি রোজ আপনার বাসায় আসব এক ঘণ্টা করে ?

মুলো পরম উৎসাহের সুরে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ, বেশ !

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—ওর তাহলে বড় সুবিধে হয়, দু বেলা দেখা হয় কিনা। মুলোর কাণ্ড দেখ—সাধে কি বলে হর্স র‍্যাডিশ !

মুলো মিস সোরাবজির সঙ্গে কথা কহিতে অন্যমনস্ক ছিল, নবীনদার বাংলা কথা শুনিতে পাইল না—নতুবা বলিত, হোয়াট ? কি বললে বাংলাতে ?

আমি ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বলিলাম—শেখালে তো বেশ হোত—কিন্তু আমাদের সময় নেই কিনা ! দুজনকে টো টো করে সারাদিন নিজের কাজে বেড়াতে হয়, নইলে এ তো বড় আনন্দের কথা।

আমরা গোরেওয়ারায় জলে নামিয়া সবাই স্নান করিলাম, মিস সোরাবজি পর্য্যন্ত। দুপুর ঘুরিয়া গিয়া একদিকে ছায়া পড়িয়াছে—এখনও সেদিনকার সেই দিনটি চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে—একদিকে অনুচ্চ কালো পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে শিউলি ও তিন্দুক গাছের সারি, দু-দশটা বড় বড় শালও আছে। আকাশে খর রৌদ্র, দুপুরের রোদে ঝক-ঝক-করা চোখ-ঠিকরানো ছোট ছোট ঢেউএর সারি হ্রদের বুকে, অথচ এপারে অনেকখানি ছায়াসিক্ত—আঁটসাট স্নানের পোশাকে শুভ্রদেহ কৃশাঙ্গী ভেনাসের মত পার্শী তরুণী জালু শৈলবেষ্টিত হ্রদের নীল জল হইতে উঠিতেছে—দূরে ওপারে গোরেওয়ারার উঁচু পাড়ের উপর একটা বাংলা ধরনের বাড়ী, বোধ হয় এক ডাকবাংলো।

আমরা রান্না করিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মিস সোরাবজির নিজের হাতের রান্না ভাত ও ডাল, কিছু মাংস, দু একটা ভাজা। পার্শী ধরনের নুন দিয়া রান্না ভাত ও মশলাবিহীন সাদা রঙের মাংসের স্টু ও বেশনে টোমাটো ভাজা—সবগুলিই আমার মুখে সমান অখাদ্য। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া নবীনদা কিছু আচার আনিয়াছিলেন—তাই দিয়া গ্রাস-কয়েক ভাত খাওয়া গেল। মুলো পোষা কুকুরটির মত মিস সোরাবজির পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মত বটে—দেখিলাম তাহার বাঙালী-প্রীতি তাহার প্রণয়িনীর প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা কম নয়। বাঙালীর সব-কিছুর সে আজ ভক্ত, আমাদের কত কি ব্যাপারের প্রশংসা সে শতমুখে যদি বলিতে পারিত তাহার প্রণয়িনীর নিকট—তবে যেন তাহার তৃপ্তি হইত। বলিল, জান জালু, ওঁরা বাংলাতে মুলো কথার বড্ড ব্যবহার করেন, প্রায়ই ওঁরা বলেন র‍্যাডিশ—আমি শিখে নিয়েছি, একটা বাংলা ইডিয়ম, মানে 'খুব ভাল'।

নবীনদা অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, মরেছে হতভাগা !

মিস সোরাবজি আমাদের দিকে চাহিয়া কৌতূহলের সুরে বলিল—ও হাউ ইণ্টারেস্টিং ! সত্যি মিঃ রায়—আপনারা বুঝি—ইত্যাদি।

মেয়েটিকে যা তা বুঝাইয়া ও অন্য কথা পাড়িয়া চাপা দিলাম জিনিসটা।

বেলা তিনটার সময় আমাদের মোটর নাগপুর হইতে ফিরিয়া গোরেওয়ারার ওপারে আসিয়া ভেঁপু দিল। সকালে পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়ী দুখানা চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করিতে মিস সোরাবজি বলিল—সূর্য্যাস্তটা দেখে যাবেন না?

—ওদিকে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে—আপনার বাবা কি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না?

—কিছু না মিঃ রায়, ভাববেন না। আমি বলে এসেছি—আমি ওই পাথরের ওপার থেকে দেখব সূর্য্যাস্তটা। তুমি এস না শুকরাম।

—যেমন ইচ্ছে আপনার। শীগগির আসবেন।

অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত। এখানে আসিয়া অবধি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভ হইতে সাতপুরা শৈলমালার দিকে প্রায়ই দেখিতেছি। সন্ধ্যার ছায়া নামে, আমি সামান্য শৈত্যের জন্য গরম আলোয়ান ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিই, হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে সাহেব মেমদের মোটরের ভিড় বাড়ে, আম্বাসিরি লেকে পার্কে দলে দলে সুসজ্জিতা নরনারীরা বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করে, আমি বড় একটা শাল গাছের তলায় নির্জ্জনে প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া দেখি ধীরে ধীরে সাতপুরা শৈলশ্রেণীর আড়ালে লাল সূর্য্যটা নামিয়া পড়িতেছে। আজও দেখিলাম। গোরেওয়ারা হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন আবীর-গোলা টকটকে লাল। যেমন সূর্য্য অস্ত গেল, অমনি চারিধারে ঘনছায়া নামিল, মোটর দুখানা অধীর ভাবে ভেঁপু বাজাইতে লাগিল, বাদুড়ের দল পাহাড়ের দিকে ফিরিতে লাগিল, ক্রমে ছায়া ঘন হইয়া অন্ধকার নামিল।

নবীনদা বলিলেন,—কই, মিস সোরাবজি কোথায়?

—এই তো ছিল, সূর্য্যাস্ত ভাল দেখা যাবে বলে পাথরটার ওপারে গিয়াছে বোধ হয়।

এমন সময় মুলোর সঙ্গে মিস সোরাবজি পাথরের ওপাশের ঘাট থেকে উঠিয়া আসিল। উভয়েই স্নান করিয়া আসিল এই অবেলায়, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

মুলো কৈফিয়তের সুরে বলিল—বড় গরম, তাই জালু বললে, বেশ স্নান করা গেল।

নবীনদা বাংলায় বললেন—তার পর তোমার জালুর নিউমোনিয়া হলে তার বাবা দেখে নেবে তোমাকে—মুলোগিরি খাটবে না তখন—

মুলো বললে—কি?

আমি উত্তর দিলাম, জালু নামটা বড় চমৎকার! মিঃ বোসের মতে। অবশ্য আমারও সেই মত।

মিস সোরাবজি সলজ্জ হাসিয়া মেমসাহেবী সুরে বলিল—ও, ইউ হরিড ক্রিচারস্!

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া চলিলাম।

সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের কিছু পূর্ব্বে পাহাড়ী ঢালুতে অনেক বনশিউলি ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল—ও মিঃ রায়, কি চমৎকার ফুল ফুটেছে! শেফালি—না?

মোটর থামাইয়া মুলো গোটাকয়েক ডাল ভাঙিয়া আনিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ লেশ মাটির বুকে। সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের এদিকটা নির্জ্জন, এ সময় খুব বেশি লোকজন নাই। হঠাৎ মেয়েটি বলিল—চলুন, আম্বাসিরি লেক দেখে আসি।

এ জ্যোৎস্নায় বেশ লাগবে।

আমরা সকলেই হতবুদ্ধি। আম্বাসিরির দিকে যাইতে হইলে আবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বিপদে ফেলিল দেখিতেছি খেয়ালী পার্শী মেয়েটা। কি করা যায়, সুন্দরী তরুণীর আবদার উপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই আমাদের—মোটর ঘুরাইয়া আবার সবাই পাহাড়ে উঠিয়া আম্বাসিরির দিকে ছুটিলাম। সেখানে লেকের ধারে পার্কে বিভিন্ন বেঞ্চিতে তখনও কেহ কেহ বসিয়া আছে। ক্রমে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া সেদিনকার থিন্‌সি লেকের স্মৃতি মনের মধ্যে আনিয়া দিল। পাহাড়ের উপর হু হু ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিল। জনবিরল হ্রদ-তীরের পার্কটিতে দূরে দূরে দু-একটি নরনারী বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সবাই নামিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আরও চমৎকার লাগিতেছিল, নতুবা সাধারণত আম্বাসিরিতে বিকালের দিকে বড় ভিড় থাকে।

মিস সোরাবজিকে বলিলাম—কেমন লাগছে?

সে মেমসাহেবী সুরে সরু মিষ্টি গলায় টানিয়া বলিল—ও, ইট্‌জ ফা-ই-ন!

'ফা' হইতে 'ন' পর্য্যন্ত টানিয়া সুরের নামা-ওঠা করিয়া উচ্চারণ করিতে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সময় লইয়া মধুর ধরনে গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলিল। এই তো কলেজের ছাত্রী, কতই বা বয়স, কুড়ি-একুশের বেশি নয়—এ সব শিখিল কোথা হইতে কে জানে। নবীনদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাংলায় বলিল—মেয়েটার আবার ভাবন দেখছ?

আমিও বাংলায় বলিলাম—আমেরিকান ফিল্ম থেকে হলিউডের অ্যাক্ট্রেসদের সুর নকল করেছে কষ্ট করে। গলা মিষ্টি বলে মানিয়েছে।

মূলোর মনে কোনও কবিত্ব নাই। সে দেখিলাম মেয়েটির সহিত সুতা ও চরকা-কাটা সম্পর্কে কি কথা বলিতেছে। মিস সোরাবজি আমার কাছে আসিয়া বলিল,—একটা কবিতা বলতে হবে—বলুন। এমন জায়গায় টাগোরের কবিতা একটি শুনব!

আবৃত্তি করিলাম—কি আর করি। মেয়েটির প্রাণে দেখিলাম সত্যই কবিত্ব আছে। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রশংসায়। কিছু না বুঝিলেও ভাষার ধ্বনিতে ও ঝংকারে তাহার মন মাতিয়া উঠিয়াছে। সে আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় শেলির একটি কবিতা আবৃত্তি করিল।

বলিলাম—গান করুন না একটা!

মিস সোরাবজি হাসিয়া বলিল—ইংরিজি গান জানি, আপনাদের পছন্দ হবে না।

—ভারতীয় মেয়ে, দিশি গান শেখেননি কেন?

—আমাদের কমিউনিটির সাহেবিয়ানা এজন্যে দায়ী মিঃ রায়। বাবা গভর্নেস রেখে ছেলে-বেলায় পড়িয়েছেন, গান শিখিয়েছেন—তারা যে পথে নিয়ে গিয়েছে, সেই পথে যেতে হয়েছে আমায়। এখন জ্ঞান হয়ে সব বুঝতে পারি। এখন আমি গান্ধীবাদী তা জানেন? খদ্দর পরি অনেক সময়, মা পরতে দেন না—এই হোল কথা। ইচ্ছে হয় আমি শিখি ভারতীয় গান—খুব ভাল লাগে আমার।

নবীনদা হাসিয়া মনের আনন্দে একটা ভাটিয়ালি গান বেসুরে গাহিয়া ফেলিলেন। মিস সোরাবজিকে ইংরিজিতে তাহার অর্থও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। গানে, গল্পে, কবিতা-আবৃত্তিতে হাসিখুশিতে সারাদিনটা কাটাইয়া রাত্রে যখন বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন যেন মাথার মধ্যে উগ্র মদের নেশা। নবীনদাবও তাই, কারণ—তিনি আসিয়া পর্য্যন্ত গুন গুন করিয়া গান করিতেছিলেন।

মিস সোরাবজির বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা দুই বন্ধু নাগপুর হইতে চলিয়া গেলাম। বছরখানেক পরে আবার একবার বিশেষ কাজে নাগপুরে আসি।

সংবাদ লইয়া শুনিলাম বৃদ্ধ ডাক্তার সোরাবজি ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পরিবার-বর্গ কেহই এখানে নাই—বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহারা বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে।

মুলোর খবর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কাহাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার সোরাবজি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মুলো জনৈক বিদেশী তরুণ ছাত্র—অমন ছাত্র নাগপুরে বহু আছে—কে কাহার খবর রাখে! আমরা ছাড়া আর সে কাহার সঙ্গে মিশিত জানি না, সুতরাং মুলোর খোঁজ লইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় হইল না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে গোরেওয়ারা হ্রদে বেড়াইতে গিয়া মুলোর দেখা পাইলাম। নবীনদা তাহাকে প্রথম দেখেন। একখানা পাথরে ঠেস দিয়া কে একজন নির্জ্জনে বসিয়া আছে দেখিয়া নবীনদাই বলিলেন—ওখানে কে দেখ তো হে!

গোরেওয়ারা শহর হইতে বহুদূরে, এত দূরে কেহ বেড়াইতে আসে না সাধারণত—স্থানটাও নির্জ্জন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে। আমি একটু কাছে গিয়া দেখি—মুলো! নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা সেই রকমই, তবে দাড়ি কামায় নাই, মাথায় চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—মুলো একখানা খাতাতে কি লিখিতেছে। এত নিবিষ্টমনে লিখিতেছে যে, আমার পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। কবি হইয়া গেল নাকি ছোকরা?

তাহার পর আমাদের সঙ্গে সে নাগপুরে ফিরিল। শুনিলাম সে এবারও পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পাইয়া মুলো ছেলেমানুষের মত খুশী। চাপেবার দুগ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া আমাদের মিষ্টান্ন শরবত খাওয়াইয়া দিল। শুনিলাম দেশে তাহার মা মারা গিয়াছেন এই বৎসরেই।

বলিল—বড্ড একলা একলা বোধ করি এখানে। মিশব কার সঙ্গে? এখানে মেশবার লোক নেই। বাঙালীদের সঙ্গে মিশে আরাম। গোরেওয়ারা লেকে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে থাকি। বেশ লাগে। একদিন ওখানে বেশ কেটেছিল। মনে আছে সেই আমাদের পিকনিক? ওরা কোথায় যে তা তো জানি নে।

দেখিলাম মূলোর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা ছবি—কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের রাজপুতানায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে চড়িয়া ইহার সেই বীর পূর্ব্বপুরুষ চলিয়াছে জয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত দেওধার যুদ্ধে, সেলিমগড়ের যুদ্ধে—চওড়া গালপাট্টাওয়ালা রুক্ষ দর্শন মুখাবয়ব, দীর্ঘ দেহ, পাশে খোলা দীর্ঘ দুধার তলোয়ার, হাতে সাত হাত লম্বা বন্দুক—মৃদুতা নাই, ভয় নাই—কবাটের মত বিশাল বক্ষে জলন্ত দুঃসাহস—কাহার সাধ্য ছিল তাহার মনোনীত কন্যাকে স্পর্শ করে! সে ছিনাইয়া আনিত তাহার প্রণয়িনীকে যে কোন লোকের হাত হইতে। লড়িত, খুন করিত।

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় জয়সিংহের সৈন্যদলের সেই বীর নায়কের বংশধর এই সাহেবী পোশাক পরা, নিখুঁত টাই বাঁধা, ঘাড় চাঁচা, ক্লিন শেভ্‌ড, হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা ছোকরা নিতান্ত নিরুপায়। কবিতা লেখা বা চোখের জল ফেলা ছাড়া সে হারানো প্রণয়িনীর জন্য কি করিতে পারে? বিশেষত যখন দুইবার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না পাইয়া সে আরও দমিয়া গিয়াছে।

ছোকরার জন্য এই সর্ব্বপ্রথম দুঃখ হইল।

সুলোচনার কাহিনী

১

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া যাইতেছি। ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিল, সুতরাং হন হন করিয়াই চলিয়াছি—এমন সময়ে বাড়ীঘরের থামের ছায়ার আলো-আঁধারির মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ যেন সেই সুলোচনার মা না? অবিকল সেই রকম দেখিতে, যদিও বহুকাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব? এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে?

একটু জোরগলায় ডাক দিলাম—শুনছেন? শুনছেন? বলি শুনছেন—এই যে! যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইল আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো বা তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় দিতেই দন্তহীন মুখে এক গাল হাসিয়া বলিল—ও তুমি যদু! আহা কতকাল দেখিনি তোমাদের! —ইত্যাদি বা ঐ ধরনের কোন উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা···ঘোড়ার ট্রাম সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে···তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্ব্বপ্রধান সুন্দরী এবং সবচেয়ে

আধুনিকা ছিল, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনের জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি, এ সেই মেয়েটির মা।

তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরন একালের মত ছিল না বটে, কিন্তু সত্যিকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে-কোন সাজে, যে-কোন ঢঙে, যে-কোন ভঙ্গিতে মানায়, এবং সুলোচনা ছিল সেই ধরনের সুন্দরী মেয়ে। তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু চম্পকগৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দুটি, সুন্দরী মুখশ্রী কলিকাতার পথেঘাটে, গলির আড়ালে আবডালে, পথের বাঁকে হঠাৎ ফিরিয়াই, কিম্বা কোন নির্জ্জন পার্কে পাদচারণরত অবস্থায় কত দিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম; দেশে ফিরিয়া কত বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথম-যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কত বার মনে পড়িত—সেই সুলোচনার কোন খবর পাই নাই আজ এত বছর, ধীরে ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল···আবার পুরানো যুগের সেই মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল।

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে-প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটা বলিয়া রাখা ভাল। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালবাসে, ভালবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে তিলে নির্ব্বোধের মত নিজের দেহ ক্ষয় করে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় ··অত রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই জানিতাম, তাই পরবর্ত্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভাল করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিত।

যাক এখন সে-সব কথা। বর্ত্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছে কেন? সুলোচনা কোথায়? কারণ ভিক্ষাই সে করিতেছিল। থামের পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দু-একটি পয়সা চাহিতেছিল আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সে-ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—এখানেই কোথাও বাসা বুঝি? দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন?—ভাল আছেন?

—আর বাবা, ভাল আর মন্দ! তুমিও যেমন!

কথাটা ভাল লাগিল না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম সুলোচনার বয়স এখন হিসাবমত প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ —সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচের কারণ কি আছে? সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নয় কারও।

—ইয়ে,—গিয়ে—সু—আপনার মেয়ে কোথায়?

—তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে? সে থাকলে আমার আজ এই···বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মত বলিলাম—ও!···

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—আজকাল আছেন কোথায়?

—রাস্তায়—গবর্নমেণ্টের রাস্তায়।

সবই বুঝিলাম। বড় কষ্ট হইল এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ীর জন্য হয় নাই। বুড়ীকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে সে বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা হোল বড ভাল হোল বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হতভাগী তো পালাল, এখন তার দুটি ছেলে, একটির বয়েস ষোল আর একটি চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দ্দশা ভাব দিকি এ বয়সে! একটা ঘরে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি রাস্তা ছাড়া এখন যাব কোথায়?

—সুলোচনা কত দিন মারা গিয়েছে?

—এই চোদ্দ বছর। ঐ কোলের ছেলেটি যখন দু-মাসের—সেই থেকে মানুষ করছি।

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। সুলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটা কারণ, আমার বয়সও তখন কম ছিল। রূপসী সুলোচনা আমার কাছে চিরদিন নারীত্বের গহন রহস্যের প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম সুযোগ। বড় কৌতূহল হইল উহার মায়ের মুখে তাহার ইতিহাস সব শুনিব।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসব। বাড়ীভাড়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে।

বুড়ী ছাড়িল না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনই। অগত্যা গেলাম। বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। একতলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মত ঘর, একটি মাত্র দোর, যেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা ভাদ্রে কি ভীষণ গুমট ঘরের মধ্যে।

সুলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিল। বড় সুন্দর ছেলে দুটি। সুলোচনার মুখচোখ ভুলিয়া গিয়েছিলাম; ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায় অভাগী সুলোচনা!···

তখনকার কালের সৌখিন মেয়ে, তখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, এ কি গৃহসজ্জা! ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচি-পোরা বালিশ, ভাঙা কলাইচটা এক-আধখানা সানকি, একটা মাটির কলসী আর দড়ির আলনায় অতি মলিন খান দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেওড়া কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোশ আছে—ছেলেদুটি তাতে শোয়, বুড়ী শোয় মেঝেতে। তাও এই ঘরে

আশ্রয় মিলিতেছে কই ? এই আস্তাবল হইতেও বাড়ীওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে।

এই কাহিনীটি আর বেশিদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সুলোচনা কে ছিল, তাহার সহিত আমার কি ভাবে আলাপ—ইহা বলিব। নতুবা গল্পের অংশও ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে।

২

১৯০৬ সালে দেশের ইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। বেচু চাটুজ্জের স্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর বাবা ছেলেপুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেইখানেই উঠিয়াছি। আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি. এ. পড়েন এবং তাঁহারই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। এই প্রকাশবাবু বড় অদ্ভুত লোক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছুদিন হাসপাতালে এবং কিছুদিন জেলে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ দিনকতক তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছিল। খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘ চেহারা, মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসাবেও যথেষ্ট মেধাবী।

আমরা প্রকাশদাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম। তিনি বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত খুশী হইয়া উঠিতেন। প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা; চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায়; মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে; ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশদার কাছে যেন বাড়ীসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিল না বাড়ীতে, তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে।

প্রকাশদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাঁহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। ইঁহারা সবাই খুব স্ফূর্ত্তিবাজ আমুদে ধরনের লোক—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্পে গানে। মাঝে মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখন আমাদের জানালা দিয়া উঁকিঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিল।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া একদিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে ?

শরৎ চুপিচুপি বলিল—কাউকে বলিস নি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিস্ট।

—তোর দাদাও ?

—হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইল।

এইখানে একদিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—প্রকাশ এখানে কবে এসেছিল? আজ আসবার কথা আছে?

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে সাদা থান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়, গায়ের রং খুব ধপধপে ফরসা, বয়স হইলেও মুখশ্রী দেখিতে ভাল। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিল। আমায় বলিল—তুমি কি কর ছেলে?

—পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে।

—এটা তোমাদের বাড়ী?

—আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি এখানে থাকি। বাড়ীতে মেয়েরা আছেন—চলুন না বাড়ীর মধ্যে, এখানে কেন বসে থাকবেন?

এই ভাবে সুলোচনার মার সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদেরও আলাপ হইয়া গেল। সুলোচনার মা কিন্তু প্রকাশদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কার্য্যে কখনও আসে না, একদিন আমার এ কথা মনে হইল। বাড়ীর মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে শুরু করিল। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুর কাছে টাকা লইতে আসে, তাহাও সকলে জানিয়া গেল। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশবাবুকে বলিত—ও প্রকাশ, বাবা এ-মাসে আর দশটা টাকা না দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না কিনে ইস্কুলে যাবে কি করে?

আমার বন্ধুকে একদিন বলিলাম—ওঁর মেয়ে আছে তা তো এতদিন শুনিনি। ওঁরা প্রকাশদার কেউ হন? প্রকাশদা টাকা দেন কেন ওঁদের?

বন্ধু বলিল—জানি ওঁর এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। আমি শুনেছি মেয়েটি সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা করে থাকে, প্রকাশদা আর সতীশদা দুজনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মার কাছে করেছিল।

—তা প্রকাশদা আর সতীশদা টাকা দেন কেন?

—ওঁরা অ্যানার্কিস্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ করে প্রকাশদার। দাদা বলে, প্রকাশদা বাড়ী থেকে যে টাকা পান, তার বেশির ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন দাদার কাছে। দুটো টিউশনি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেন।

আমার ক্রমে মনে হইল বুড়ী প্রকাশদার কাছে নানা রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করিতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের অজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ীর লাগিয়াই আছে। প্রকাশদাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনদিন। বুড়ীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম।

বুড়ী বলিলাম বটে কিন্তু সুলোচনার মা সে-যুগে বুড়ী ছিল না।

কতবার ভাবিতাম প্রকাশদাকে বলি, উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, আপনি যখনই যা চায় তা দেন কেন? কিন্তু প্রকাশদাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনও সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

৩

এখানে একদিন সুলোচনা আসিল তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে। পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বছর ষোল কি সতের বয়স, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিনুনি দোলানো, যেমন চোখ তেমন ধপধপে গায়ের রং, তেমনই নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর প্রায়ই আসিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া প্রকাশদার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশির ভাগ কথাবার্ত্তা বলে প্রকাশদার সঙ্গেই। প্রকাশদা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ বাড়ীতে থাকেন, বড় একটা অন্য কোথাও নড়িতে দেখি নাই।

প্রকাশদা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড় বিরক্ত করিত। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, কে জানে। টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, সুলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, নয়তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল, নয়তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিল। পড়িতে দিবে না কিছুতেই; পড়া থাক, তাহার সঙ্গে ছাদে কে যাইবে? ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি। এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশদা থাকিলে সুলোচনা এ রকম করিত না। তখন তার অন্য মূর্ত্তি। ধীর, স্থির, বেশি হাসিত না, বেশি বকিত না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখমুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশদা সুলোচনাকে 'সু' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া আমরাও সবাই তাকে 'সু' বলিতাম। একদিন সুলোচনা তাহাতে আপত্তি করিল। শরৎকে বলিল—প্রকাশদা যা বলেন,' তোমরাও তাই বলবে কেন? ও নামে ডেকো না, কানে ভাল লাগে না।···আমার বড় রাগ হইল। সুলোচনার চাল-দেওয়া ধরনের কথাবার্ত্তা আমার সহ্য হইত না—আমার মনে হইত মেয়েটি অত্যন্ত গর্ব্বিতা ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম—তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে মিশতে এসো না। সুলোচনার সহিত আমাদের এ ধরনের খুনসুটি ঝগড়া প্রায়ই চলিত। তবে সে যে সব সময়ে আমাদের বাসায় আসিত তা নয়, মাসের মধ্যে দশ-বারো দিনের বেশি না। প্রকাশদা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন দিন ছাড়া সুলোচনার

এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি সুলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ সতীশদা সুলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার বন্ধু শরৎ বলিত সুলোচনাদের কলিকাতার বাসাভাড়া ও বাসার সমস্ত খরচ নাকি সতীশদা দিতেন। কিন্তু সুলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিত না তাহা কি করিয়া বলিব?

একদিনের কথা বলি। সেদিন সতীশদা আসিবার কিছু পরে সুলোচনা তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিল—সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়ে আনবে বাবা? সুলোচনাও বলিল—হ্যাঁ মামা (সতীশবাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিত), চল আমিও যাব।

সতীশদা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাঁহার চোখমুখের খুশির ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হইল। উৎসাহের সহিত বলিলেন—হাঁ হাঁ। বরং চল দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরে স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসব—সেও বড় চমৎকার জায়গা গঙ্গার ধারে।

সুলোচনার মা বলিলেন—তাহলে অমনি পেনেটির দ্বাদশ শিবের মন্দিরও দেখে আসি চল না?

সুলোচনাও বলিল—বড্ড মজা হয় মামা। একখানা গাড়ী ডাক। সতীশদা গাড়ী ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশদা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিল তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না তাহা আমি জানি না, সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে বলিল—সে কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন। সতীশদা ইতিমধ্যে গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিলেন কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশদাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারী সতীশদার শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইল। অবশ্য আমার বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পাও নড়িতে চাহিল না।

বছর দুই এইভাবে নানা সুখদুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া পরে ১৯০৮ সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্রজীবনের বাকি বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তাহার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও নাই একদিনের জন্য। সতীশদাকেও আর কখনও দেখি নাই। ইহাদের না দেখিবার কারণও যথেষ্ট ছিল, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিল।

তবে প্রকাশদার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে আমার ছাত্রজীবনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশদা অদ্ভুত ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই; পূর্ববঙ্গের কোথায় স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে একথা শুনিয়াছিলাম।

বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরি করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে নামিয়া শেয়ালদহ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদহ নর্থ স্টেশন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ স্টেশনের সম্মুখে ভাড়াটে গাড়ীর আড্ডা, ওখানে অনেক চা পান শরবত ইত্যাদির দোকান ছিল। একটি দোকানে শরবত খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবত খাইতেছে। দু-একবার গোপনে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়স বাইশ-তেইশ হইবে—চোখ যেন ফিরানো যায় না তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব্ব রূপসী বটে মেয়েটি!···আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আরে যদুদা যে!

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না, বলিলাম—সুলোচনা যে! কোথা থেকে? তোমার মা কোথায়? কি করছ এখন?

সুলোচনা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া সর্ব্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিল—প্রকাশদার কোন খবর পেয়েছ?

প্রকাশদার মৃত্যুসংবাদ তখন আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সেকথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চায় না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, আমার বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—অনেক-দিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চল তো রায় মশায়ের হোটেলে!

সেই পুরানো দিনের মতই নিঃসংকোচ ব্যবহার সুলোচনার; মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মত ব্যবহার, ধরন-ধারণ, সেই সবই বজায় আছে অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল-শাড়ি ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিকচিকে সরু চেন ও পেনডেণ্ট, পায়ে রুপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু-ফিতা বাঁধা হাতঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইল সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার শৌখিনতার প্রতি স্নেহ হইল—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না করিবে, সেণ্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সেসব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য? সুলোচনার অঙ্গে শাড়ী ব্লাউজ অলংকার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া যায় নাই কি?

আমি বলিলাম—আরে ছাড় ছাড়, হাত ধরে ওরকম টানাটানি ক'রো না—রায়মশায় কেন, চল ট্রামে ন্যাশনাল হোটেলে বাই কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটি বাদ সাধিল, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইত না।

ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিল—ট্রেনের দেরি নেই, কোথায় যাবে এখন বৌদি? এস, চল

—বাঃ—! এমন কি, মনে হইল যে ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইল—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বাপু! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছ আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে! সুলোচনা যে খুব ভাল মেয়ে নয়, এ ধারণা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। বেচারী প্রকাশদা! মেয়েদের ভালবাসার এই তো মূল্য। অন্তত সুলোচনার মত মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—দমদমায় বাসা আজকাল। যেও একদিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পিছনে নরেশ পালের বাগানবাড়ী—

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগানবাড়ী খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই।

বছরখানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি তখনই বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া ট্রামখানাতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশী হইল। বলিল—উঃ, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি কে এসে ঝুপ করে পাশে বসে পড়ল রে বাবা।—ভাল? কতদিন দেখা হয়নি—সেই শেয়ালদা স্টেশনে সেবার—দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিল। সুলোচনা বলিল—নাম এখানে যদু-দা, কুরুশ কাঁটা কিনব আর ছেলেটার জন্যে হর্লিক কিনব। আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিল—আজকাল আমার স্বামী এসেছেন যে, আজ প্রায় বছরখানেক। এখন যে রোজগার করছি দু-পয়সা, আসবে বৈকি। এতদিন কেউ খোঁজও নেয়নি।

—আজকাল কি কর?

—বা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এতদিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম—এখন স্বামী ফিরে আসতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমার সঙ্গে দেখা তখন থেকে দমদমায় বাসা। এস না আজ, চল—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—

—না, আজ থাক্, আর এক দিন হবে। চল—চা খাবে সুলোচনা?

—শোন বলি। তুমি ছলে গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেও না। ওকে একটা হার কেন দাও না?

আমার বড় রাগ হইল। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে সুলোচনা মায়ের মতই পটু হইয়া উঠিয়াছে। আপন মামা হইলেও আজকালকার বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইব? বলিলাম—এখন যাব না তোমার বাসায়। বড় ব্যস্ত আছি।

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় সুলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোন চায়ের দোকানে ঢুকিতে সংকোচ মনে হয়—বিশেষত মনে রাখিবেন, ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইত। হইলও তাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে সুলোচনার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উপর সুলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথার। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিল—যাবে না বই কি, ইঃ! ভাগ্‌নের মুখ দেখনি, দেওয়ার ভয়ে বোনের বাড়ী যাবে না—লজ্জা করে না বলতে? যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি সামনের শনিবারে যাবে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত; কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিল, কোথা হইতে বা আবার আসিল, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে সুলোচনা কখনও মিথ্যা বলে না ইহা আমি জানিতাম। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিত যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই সুলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উলবোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ীর কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশে বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিল—এস, ব'স যদু-দা!

বলিলাম—আজ নয় সুলোচনা—মাপ কর। কাজ আছে।

সুলোচনা অভিমানের সুরে বলিল—না, থাক্ কাজ। এস—আসতেই হবে। কত কথা আছে তোমার সঙ্গে—রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হোল! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইব?

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, প্রকাশদার আর কোনও খবর পাওনি?

বলিলাম—নাঃ, কই আর। মনে মনে ভাবিলাম—সে-কথা জেনে তোমার লাভই বা কি এখন।

—বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কইব, এমন আর লোক কই এক তুমি ছাড়া?

—কেন, সতীশদা কোথায়?

—মামা ? মামা বিয়েথা করে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মত মানুষে আর এর বেশি কি করবে। প্রকাশদার মত কি সবাই ?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিল—সত্যি, আসবে না নাকি যদু-দা ? এস বস।

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্ম্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল করি। চাকরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা!

সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা এ-সব।

৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিল।

তাহাকে বাড়ীভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতাম না আপনাদের সম্বন্ধে। যা জানি, ভাসা-ভাসা ভাবে জানি। সবটা বলুন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। পার্কে ছেলেমেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুগনি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতেও তেমনই অপূর্ব্ব। কিন্তু বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমত গুছাইয়া বলা হইবে না। তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।—

ওদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। সুলোচনার যখন আট বছর বয়স, তখন ওর বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ, স্বামীর চেহারা ভাল ছিল না বলিয়া ছেলে-মানুষ মেয়ে তার কাছে বড় একটা যাইতে চাহিত না। স্বামী ছিল মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বছরের স্ত্রীর উপর মারধোর ও নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। ফলে ওর মা দেশের জায়গা জমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিল—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীন ভাবে থাকিবার কোন সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন প্রভৃতিকে লোকে ভাল চোখে দেখিত না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গায় বেড়াইল। হাতের পয়সা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। এদিকে আরও নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব্ব রূপসী, দশ বছরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তের-চৌদ্দ বছরের

মত—দুষ্ট লোকের চোখ পড়িল মেয়ের উপর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিল—চল আজ গঙ্গায় ডুবে মরব দুজনে—এখানে আর কোনও সুবিধে নেই—এবার মান যাবে। গরিবের কেউ নেই।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল।

রাত নটার সময় মেয়ে বলিল—কখন আমরা ডুবব মা? অন্নপূর্ণার ঘাটে চল যাই।

মা বলিল—এখনও সব ঘাটে লোক। এখন না, দেরি কর—

রাত দশটার সময় মা মেয়ের হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—হ্যাঁ রে, পারবি তো? বল আগে থেকে, পারবি তো?

মেয়ে এতটুকু ভয় খায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি সঙ্গে থাকলে মা ঠিক পারব।

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, আপিসের কেরানী, ঘাটের কাছেই কোথায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? আর ব্যাপারই বা কি? কি বলাবলি করছেন আপনারা? বাসা কোথায় আপনাদের?

যামিনী ঘোষের প্রশ্নের স্বরে বালিকা থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা সব খুলিয়া বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসায় লইয়া গেল।

দিন পনের কাটিল মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভাল, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবত যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া একবার দেখিতে আসিল। সেই যে আসিল, আর সে বাড়ী ছাড়িতে চায় না। তার আসা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরও ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছন দিকে চুল ফিরাইত বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মার কাছে তাহার নাম রাখিয়াছিল—কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিল—মা, কাকাতুয়া ভারি দুষ্টু। আমাকে গহনার বাক্স দেখিয়ে বলে কিনা—আমার সঙ্গে যাবি? তোকে এই সব গহনা দেব—আমি ওর সামনে আর বেরব না।

মা বলিল,—হতচ্ছাড়া মেয়ে, তুই বা যাস কেন সকলের সামনে? বাড়ীর মধ্যে থাকবি, যার-তার সামনে বেরনো, গল্প করা কি ভাল? আমরা গরিব লোক, আমাদের কত বিপদ জানিস?

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিল, সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিল বটে কিন্তু দিনকতক পরে সেখানেও গোলযোগ বাধিল। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইল। এমন কি, সতীশের মা সুলোচনা বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। মাকে বলিল—মেয়েমানুষের ক-বার বিয়ে হয়? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আমায় আর লেখাপড়া শেখাতে

হবে না তোমায়—তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে এস, সেখানে বাঁচি স্যার মরি। ঢের হয়েছে।

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশদা।

প্রকাশদা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নাম-করা স্বদেশী। অ্যানার্কিস্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশদা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রকাশদা মাঝে মাঝে তাঁহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড় বিরক্ত করিয়া তুলিল। একই বাড়ীতে থাকা, সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নাই। নানারকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিল—সেন্ট, সাবান, কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিল—মামা, এ-সব কেন দিস? তুই বড় স্বার্থপর। এ-সব আমি নেব না।

মাকে বলিত—মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ বয়সে, প্রকাশদার মত মানুষ এ পর্য্যন্ত আর দেখি নি। অন্য ধাতের একেবারে। উনি মানুষ না দেবতা তাই ভাবি।

সতীশ দিত দামী দামী কাপড়, একবার পূজায় একখানা ভাল বেনারসী শাড়ী দিল। প্রকাশদা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ী। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশদার দেওয়া সেই মোটা শাড়ী পরিয়া। সতীশদার দেওয়া ভাল শাড়ী সে কদাচিৎ ব্যবহার করিত, কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ী দুখানা পরিয়া রোজ স্কুলে যাইত।

একদিন সে প্রকাশদাকে সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিল। প্রকাশদা বলিলেন—এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত না। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় বাসা কর, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুলোচনার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতি কানাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা করিয়া থাকিত। সুলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিল। আসিবার সময় সুলোচনা প্রকাশদার দেওয়া মোটা শাড়ী পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড় জামা সেখানেই রাখিয়া আসিল। সতীশ এই ব্যাপারে দিনকতক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। মা মেয়েকে বলিল—কেন সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি? ওর মনে কষ্ট দেওয়া হল না?

সুলোচনা বলিল—কষ্ট না পেলে মামার জ্ঞান হবে না মা। তা ছাড়া, দেখছ না, আমাদের জন্যে ও সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছিল, ওর দেওয়া জিনিস আর নেব না।

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিত, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িত না। সুলোচনা বলিত—মামা, আবার কেন আসিস? তুই বড় স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভাল লাগে না। দেখ দিকি প্রকাশদাকে?

একদিন সতীশ বলিল—আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশী হবি সুলোচনা? বল, আমি তাই করব।

সুলোচনা বলিল—তুই বিয়ে কর মামা। খুব খুশী হব তাহলে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করবার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব লীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল।

নূতন বাসায় প্রকাশদা কিন্তু বেশি আসিতেন না এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশদার আসিবার কথা থাকিত, সেদিন সুলোচনা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিত।

এই সময় আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হইল। কি করিয়া প্রকাশদা ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন সে-কথা সুলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশদা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন। সুলোচনা বড় ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিত বলিয়া তাহার মা একদিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিল কলেজেও প্রকাশদা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছ মাস পরে প্রকাশদা হঠাৎ একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা হাতে ওদের বাসায় আসিয়া হাজির। সুলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিল। বলিল—কোথায় ছিলে প্রকাশদা এতদিন? চেহারা এমন হয়েছে কেন তোমার।

প্রকাশদা বলিলেন—সে কথা জিজ্ঞেস করিস কেন সু। তা ছাড়া, এই শেষ। আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়তো পারব না। যাবার সময় একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই—হয়তো আর দেখাই হবে না—সু, তুই আমায় কখনও ঘৃণা করবি নে বল?

সুলোচনা বলিল—তোমাকে অনেক ভালবাসি প্রকাশদা। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরও নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি—তা না হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম।—একলা যেতে দিতুম না।

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনার মা আমায় বলিল—মেয়ে আমার কখনও কাঁদত না। এই অনেকদিন পরে কাঁদল। যাবার সময় প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলে বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ সেই যে গেল, আর কখনও ফিরে আসে নি।

আমি বলিলাম—তার পর? আপনাদের কি হল?

—তার পর প্রকাশ তো চলে গেল। শোন সব কথা, বিশ্বাস করবে না হয়তো। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ারমুখী মেয়ের আগুনের মত রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ গিয়েছে আমাদের! দেখেছিলে তো তাকে?

দেখিয়াছিলাম বই কি। আবার এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্নের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনার সেই অপূর্ব্বসুন্দর কিশোরীমূর্ত্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ, ঘন-কালো চুলের রাশি···কথার সেই ভঙ্গি ··চমৎকার মুখের হাসি···সর্ব্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী···

তখন সুলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন সুলোচনাকে সে

সময় চরিত্রহীনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ভাবিয়াছি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসায় মেয়েরা সুলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিত। আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে মনে পরলোকবাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সুলোচনার মা বলিল—মেয়ে রোজ কাঁদে প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানলা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে বাসায় আমরা ছিলাম, তারা ঠিকমত টাকা দিতে না পারাতে আমাদের রাখতে চাইলে না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট্ট একটি খোলার ঘরে আশ্রয় নিলাম। একদিন সেখানে এল কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালে। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে বললে—মা, চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়তো আর পারি নে। আমি বাড়ী নেই, গুণ্ডার দল বাড়ী ঘিরে ফেলেছে—বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালীঘাটে, ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে! মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে—চুলে আগুন জেলে মরবে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম —লোক-ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালাল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সতীশদা যেত না বাসায়?

—যেত, টাকা দিয়ে আসত আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভাল কথাও ইদানীং বলত না। আগে আগে ওর চিঠির এক-আধখানার উত্তর দিত—শেষে তাও বন্ধ করে দিলে। আমায় বলত—না মা ওকে আসতে দিও না। ও যে সর্ব্বস্বান্ত হল আমাদের দিয়ে। কুকুরের মত আমরা ওর টাকা খাচ্ছি কেন? ও বিয়ে-থাওয়া করবে না আমাদের না ছাড়লে।

এই সময় পাড়ার এক সহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করিয়া সুলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিলেন—পাশ করিয়া প্রথমত সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায়। কিছুদিন সেখানে কাজ করিবার পরে একদিন মাকে আসিয়া বলিল—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর আমার কাজ করা চলবে না। ছেড়ে দিয়ে এলুম।

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিল। তখন ওদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যেও বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকের বাসন্তী প্রেমের-স্বপ্ন সে—কত প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইত! গুণ্ডার হাতে পড়িতে পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে। একদিন মাকে বলিল—প্রকাশদা ফিরে এসে এ রকম দেখে খুশী হবে না। সে দেখে অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ কখনও করব না। তুমি আলাদা ছোট বাসা কর—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।

তাহাই হইল। হোস্টেলে দুজনের নাম দিল যারা দেখা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশদার—আশা ছিল প্রকাশদা একদিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কখনও এর পরে প্রকাশদার পত্র-টত্র আসত না?

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কখনও না। মেয়ে প্রকাশদা বলতে অজ্ঞান। ভাবত, প্রকাশ আসবে ফিরে। আমায় কতদিন বলেছে এ-কথা। প্রকাশ দেখে খুশী হবে বলেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা হল ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—অতিথিশালা! সে কি রকম?

—মেয়ের খেয়াল! এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমার অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশী করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

—ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার?

—আমরা আনি নি বাবা। ক্যাম্বেলে একজন রুগী এসেছিল সুলোচনার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলে। স্বামী এসে পড়ল, মাপ চাইলে—আমরাও জায়গা দিলাম এই ভেবে যে স্বামী ভিন্ন বাইবে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র নেই, সবাই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হল অতিথিশালা।

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিল। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিল—তোমার কথা বলেছিল এখন আমার মনে হচ্ছে বাবা। তার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করতে লাগল। বেশ দু-পয়সা আয় হল। দুটি ছেলে হল। জামাইয়ের এক কাঁড়ি দেনা ছিল দেশে, সব ও শোধ দিলে। সেই সময় একদিন কে এসে বললে দমদমার বাসায়—প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে গেল—সেই থেকে বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল। খবরটা শোনার পর মোটে ছটি মাস বেঁচে ছিল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিল—সন্ন্যিসি হয়ে যাব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গিয়েছে আজ, আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে এখনও ভুগছি বন্ধনে। সে স্বামীকে ভাল করলে, তাকে মদ ছাড়ালে, মানুষ করলে—করে মরে গেল। জামাইও মারা গিয়েছেন। এখন আমি যদি মরে যাই ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে! রাস্তায়—গবর্নমেণ্টের রাস্তায়!

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ইদানীং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখ নি। খাট, আলমারী, বাসন,—সুলোচনা প্র্যাক্‌টিসে বেশ রোজগার করত—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিল। শৌখিন ছিল খুব, সে তুমিও তো দেখেছ। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু-চোখে দেখতে পারত না। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল—জামাইয়ের হাতে অনেক টাকা পড়ল মেয়ে মারা যাওয়ার পরে। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু হাজার

টাকা ধার দিয়েছিল—তার পরে সেও তো মরে গেল। হ্যাণ্ডনোটখানা এখনও আছে, হ্যাঁ বাবা, তাতে কিছু হয়?

বুড়ীকে বলিলাম, চোদ্দ বছর পরে সে হ্যাণ্ডনোটে আর কিছু হইবে না; রাখিয়া ঘরের জঞ্জাল বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা তার নাই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখেছিলাম। সে কে জানেন?

বুড়ী বলিল—শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো? বছর বাইশ বয়েস? ও তো তার দেওর। পুন্নর জ্যাঠতুত ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়ত।

আমার কতদিনের ভুল ভাঙিয়া গেল। কি অবিচার করিয়াছি সুলোচনার প্রতি!

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিত, সে যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পছন্দ করিত না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিল। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিত আশার কুহকে।

ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড় মনে পড়ে।

বেচারী

কলিকাতায় বোমার হাঙ্গামা উপলক্ষে বহুদিনের কলিকাতা-বাস ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী আশ্রয় লইয়াছি।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। রেল ষ্টেশন হইতে সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে গেলে গ্রামে পৌঁছানো যায়। ভগ্নীপতিদের মেটে বাড়ী, তাহাদেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না; তবে বিপদের দিনে, আপাতত বোমায় মরিতে বসিয়াছি দেখিয়া তাহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও বাহিরের ঘরখানি আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিল। আমরা গরুর গাড়ী হইতে নামিতেই দেখি বাহিরের ঘর হইতে তিনটি তোরঙ্গ, একটি বড় বিছানা, গোটা দুই পুঁটুলি স্থানান্তরিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমার ভগ্নীপতির মেজভাইয়ের শ্যালীপতি-ভ্রাতাও সপরিবারে ইছাপুর না দমদম হইতে সপ্তাহ খানেক পূর্বে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন এবং বাহিরের ঘরে তাঁহারাই ছিলেন। বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘরের পাশে যে নাতিক্ষুদ্র ভাঁড়ার ঘর আছে, আপাতত সেখানাতেই তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বহুদিন কলিকাতায় বাসা করিয়া আছি, বাড়ী করিবার সঙ্গতি অবশ্য নাই। সঙ্গতি ছিল না এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, জাপানী বোমার ঘায়ে সে বাড়ী কতক্ষণ টিকিত? আমার যে-সব বন্ধুবান্ধবকে কলিকাতায় বাড়ী করিবার জন্য এতদিন হিংসা করিতাম, আজ তাহাদের

প্রতি সে হিংসার ভাব করুণা ও সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। বেচারীদের পয়সাগুলা অনর্থক নষ্ট হইল।

দু একদিন কাটিয়া গেল।

চারিদিকে চাহিয়া দেখি গ্রামের মধ্যে ভীষণ জঙ্গল, খানা ডোবা বাঁশবন। শীতের শেষ, স্ত্রী একদিন আমায় আসিয়া বলিলেন, ওগো, কত চালতে পড়ে আছে বনের মধ্যে, দেখবে এস—

আমার স্ত্রী শহরের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ের বনে বাগানে পাকা চালতে শীতকালে পড়িয়া থাকা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়, তাহা না বলিয়া তাঁহার আনন্দটাকে আরো ঘনীভূত হইবার অবকাশ দিবার জন্য দুজনে বনের দিকে ছুটিয়া গেলাম।

—ওই দেখ এসে, ঢোক এই বনের মধ্যে।

—ওঃ তাই তো! এ যে অনেক দেখছি!

—এক একটা চালতের দাম কলকাতায় দু পয়সা—আর দেখ এখানে কিনতে হয় না। কুড়িয়ে নেব—হ্যাঁগো, কেউ কিছু বলবে না তো?

—কে আবার কি বলবে। বাগানে চালতে পড়ে আছে, কুড়িয়ে নেবে তা কে কি বলবে এসব পাড়াগাঁয়ে।

এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন—ও কে গো?

চাহিয়া দেখি একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক একটা ঝুড়ি হাতে ওদিক হইতে বন ঠেলিয়া গাছতলায় সন্তর্পণে চলিতে কুড়াইতে আসিতেছে। আমাদের দুজনকে দেখিয়া সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থমকিয়া পড়িল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম—চালতে গাছ কি তোমাদের? দুটো চালতে কুড়ুচ্ছি কিন্তু—

যুবক হাসিয়া বলিল—ইউ মে টেক, নট মাই ট্রি।

তাই তো, এ দেখিতেছি ইংরেজি-জানা লোক, নিতান্ত গ্রাম্য লোক নয় তাহা হইলে। যদিও আমার সঙ্গে ইংরেজি বলার সার্থকতা কি তাহা বুঝিলাম না।

বলিলাম—আপনার বাড়ী এখানেই বুঝি?

—নো, আই ওয়াজ এ ক্লার্ক য়্যাট ক্যালকাটা, নাউ আই য়্যাম হিয়ার।

—বেশ বেশ, তাহলে আমাদের মতই অবস্থা দেখছি। জাপানী বোমার ভয়?

যুবক হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল, হাঁ না কিছুই বলিল না।

বৈকালের দিকে ছোকরার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ হইল। জানিলাম, তাহার নাম সুরেশ। আমার ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে যে মুখুজ্যেবাড়ী, সে সেই বাড়ীর রাসু মুখুজ্যের শ্যালক। মুখুজ্যেবাড়ীর অন্যান্য লোকে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে, কখনও বাড়ীঘরে না আসার দরুন পৈতৃক সুবৃহৎ দোতলা বাড়ী ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, বর্ত্তমানে সেই বাড়ীর রাসু মুখুজ্যেই গবর্নমেণ্টের দপ্তরখানায় কেরানীগিরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিয়া তিন বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। গোটা

পঞ্চাশেক টাকা পেনশন পান বলিয়া দেশে আছেন, নতুবা কলিকাতায় বাসা করিতেন।

বলিলাম—তুমি কি এই তিন বছরই এখানে আছ?

—হ্যাঁ দাদা। হোয়ার শ্যাল আই গো? এখন চাকরি নেই কিনা। তবে শীগগিরই হবে।

—বেশ বেশ, খুব ভাল। তোমাদের দেশ কোথায়?

—দেশ ছিল ক্যালকাটার পাশেই—ইয়ে রাজবল্লভপুর, টালিগঞ্জের ওদিকে। এখন সেখানে কেউ নেই। মা এখানেই থাকেন, দিদি আছেন। আমিও এখানেই এখন আছি, তবে আই হোপ, এই মার্চ মাসেই আই উইল সিকিওর এ সার্ভিস। আই অ্যাম এ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌।

—বাঃ, খুব ভাল।

ছোকরার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বেশ একটু কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। বেশ চেহারা, মাথায় চেরা সিঁথিটি যত্নে তৈরি করা, পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে বিড়ি টানিতেছিল, আমায় দেখিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে।

—আপনি বুঝি সার, ক্যালকাটাতেই—

—হ্যাঁ, আমার কর্ম্মস্থান কলকাতাতেই ছিল, স্কুলে মাস্টারি করতাম। এখন স্কুল সব বন্ধ, তাই এখানে—

—আপনি কি পাশ সার?

—এম এ পাশ করেছিলাম।

ছোকরা বিনয়ে সম্ভ্রমে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—দেন্ ইউ আর এ কাল্‌চার্ড ম্যান সার—ভারি খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আই অ্যাম ওন্‌লি ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌—কিন্তু দেখুন সার, লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি।

—সে তো খুব আনন্দের কথা। ভদ্রলোকের ছেলে, হবারই তো কথা।

—প্রেস্টিস সাহেব দাদাবাবুদের বড়সাহেব। একদিন দাদাবাবুদের আপিসে গিয়ে চুপ করে বসে আছি, প্রেস্টিস সাহেব যাচ্ছে বারান্দা দিয়ে। জানেন তো সার, প্রেস্টিস সাহেব, চিফ সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেণ্ট অব বেঙ্গল—কি চেহারা! গটমট করে যাচ্ছে কি—সাহেব বাচ্চা! দাদাবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে গেল একেবারে। দেখেছেন প্রেস্টিস সাহেবকে দাদা?

—না।

—মস্তলোক প্রেস্টিস সাহেব। দেখুন, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশে এসেছি, এখন এই পাড়াগাঁয়ে যত সব আনকাল্‌চার্ড লোকের সঙ্গে মেশা—আই ডু নট লাইক ইট।

যদিও বুঝিলাম না সে প্রেস্টিস সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা কি ভাবে এবং কখন করিল, তবুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিলাম, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর কাছে সব বলিলাম। স্ত্রী বলিলেন—আহা, ছোকরাটি ভাল, এখানে ভগ্নীপতির বাড়ী পড়ে আছে কেন? অল্প বয়েস—চাকরি করে না কেন?

—বেকারের সংখ্যা তো জান না দেশের! কত বি এ, এম এ, ফ্যা-ফ্যা করছে এ বাজারে —ও তো সামান্য ম্যাট্রিক, ওকে চাকরি দিচ্ছে কে।

দিনকতক কাটিয়া গেল। একটি জিনিস খুব কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিলাম, পাড়াগাঁয়ে লোকে সময় কি করিয়া কাটায়। এসব নির্জ্জন পল্লীগ্রামে সময় কাটানো যে কত কষ্টকর তা যাঁহার অভিজ্ঞতা নাই তিনি বুঝিবেন না। কলিকাতা হইতে আসিয়া নিতান্তই কষ্টে পড়িয়াছিলাম, অথচ দেখিলাম পেন্‌শন-প্রাপ্ত রাসু মুখুজ্যে সকালে উঠিয়া একখানা ন-হাতি কাপড় পরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন, মানকচুর চারা এখান হইতে ওখানে পুঁতিতেছেন, মাঝে মাঝে তামাক খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন—নিতুবাবু যে? কোথায় চললে?

—যাব আর কোথায়! আপনাদের গ্রামে মোটে তিনঘর ভদ্রলোক, কার বাড়ী গিয়েই বা বসি?

—এস এস, আমার এখানে একটু বস। তামাক খাও?

—আজ্ঞে না।

তিনি আমার পাশে আসিয়া বসিলেন এবং কি করিয়া বাড়ীর পিছনের জমিতে আর-বছর কুমড়া লাগাইয়াছিলেন, এবার মানকচু কি রকম পুঁতিয়াছেন—এই সকল গল্প কিছুক্ষণ করিয়া আমায় বলিলেন—চা খাবে? ও সুরেশ—

রাসু মুখুজ্যের শ্যালক আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে দুজনের জন্য চা আনিতে বলিয়া আমায় বলিলেন—এই গ্রামে ধর পঁচিশ বছর পরে এসে আজ তিন বছর বাস করছি—তা আছি বেশ। ঝঞ্ঝাট নেই—খাঁটি দুধটুকু বাড়ীর গরুর—

পল্লীগ্রামের সুখ-সুবিধার নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা আসিয়া গেল।

ছোকরা চা দিয়া বলিল—গুড় আর চিনি নেই, দিদি বলে দিলে।

রাসু মুখুজ্যে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—নেই তা নিয়ে এস গে না বাজার থেকে···আমায় বলতে এসেছেন চিনি নেই! যাও, বাজার থেকে এনে রাখ। তোমার দিদির কাছ থেকে পয়সা নাও গে যাও—ফুড়েমি আমি একেবারে দেখতে পারি নে।

ছোকরা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দুইটি তেলের ভাঁড় আর একটা ছোট থলের প্যাকেট লইয়া আমাদের সামনে দিয়াই, বোধ হয় বাজারেই চলিল। বেলা প্রায় দশটা বাজে, নেউলের বাজার এখান হইতে যাতায়াতে সাত মাইল পথ—রাসু মুখুজ্যে যে তাঁহার শ্যালকটির উপর যথেষ্ট স্নেহশীল নহেন, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারিলাম।

সন্ধ্যাবেলা দু ধারে জঙ্গলাবৃত সরু পথে একটু পায়চারি করিতেছি, রাসু মুখুজ্যের শ্যালক পিছন হইতে বলিল—সার?

—এই যে সুরেশ! খবর কি?

—ভাল লাগে না সার একটুও এখানে। আসুন কোথাও বসে গল্প করা যাক। আসুন আমার সঙ্গে।

কিছুদূর গিয়া একটা চারিদিক খোলা চালাঘর।

ছোকরা বলিল—এই হল গাঁয়ের বারোয়ারী ঘর, অর্থাৎ টাউন হল।

—ও

—দেখুন তো যত সব চাষার কাণ্ড! এমন গাঁয়ে ভদ্রলোক থাকে?

—তা তো হল, এখানে বসবে নাকি? কি পেতে বসবে এখানে?

—দাঁড়ান, নবীনের বাড়ী থেকে দুটো বিচুলি নিয়ে আসি। তা ছাড়া আর কি পাতি বলুন।

কিছুক্ষণ পরে ছোকরা বিচালি হাতে ফিরিয়া বলিল, একটু চায়ের বন্দোবস্ত করে এলাম। নবীনের বাড়ী বলে এলাম—এখুনি করে দিয়ে যাবে। ওরা জাতে কাপালী। আপনি যেন দাদাবাবুকে বলবেন না গিয়ে। দাদাবাবু বড় বকে! আচার-বিচের খুব কিনা? বড্ড গোঁড়া—ভেরি অর্থোডক্স।

বলিলাম—ও।

ছোকরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া হঠাৎ কোনও কথা মনে পড়িবার ধরনে বলিল—আমি আজ পাড়াগাঁয়ে আছি বটে, কিন্তু দাদা বড় বড় লোকের সঙ্গে—আচ্ছা আপনি ল্যাম্বেথ সাহেবকে চিনতেন? আমি তাঁকে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবে দেখেছি সাত হাতের মধ্যে। জে. সি. ল্যাম্বেথ, ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার ছিলেন, ইদানীং ডি আই জির পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়েছিলেন—সাড়ে সাত শ টাকা মাইনে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—বল কি! সাত হাতের মধ্যে? পুলিশ ক্লাবে কি জন্যে গিয়েছিলে?

অতীত গৌরবের দিনের স্মৃতি মনে পড়াতে মানুষের মুখে যে আনন্দের রেখা ফুটিয়া ওঠে, ছোকরার সারা মুখমণ্ডলে তাহা পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম। সে স্বপ্নভরা চোখ আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—কুণ্ডু র‍্যাণ্ড সন্স কেটারার ছিল পুলিশ ক্লাবের অ্যানুয়েল গ্যাদারিংএ; কুণ্ডুদের বড় ছেলে হরিচরণ আমার বুজম্ ফ্রেণ্ড কিনা! তারা একখানা করে কার্ড দিত, এতবড় কার্ড, সোনার জলে নাম লেখা। আমি দু বার গিয়েছি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে গ্যাদারিং হত। আমি প্লেটে কেক দিতে গেলাম, আমায় হিউজেস বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ!

—হিউজেস সাহেব আবার কে?

—জোসেফ হিউজেস, ম্যাক-আর্থার কোম্পানির বড়সাহেব—ওই যে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে পাঁচতলা মস্ত বড় বিল্ডিং—সাত শ ক্লার্ক খাটে তার আণ্ডারে। এই গোঁফ, চোখ দুটো দেখলে ভয় করে, বাঘের জাত। সে কিন্তু কেমন হেসে বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ। আচ্ছা, ওরা এমনি খুব ভদ্রলোক, কি বলেন?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, বাঃ—

ছোকরার কিন্তু আমার উত্তরের দিকে আদৌ মন ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে পূর্ব্ববৎ স্বপ্নময় চোখে বলিয়া চলিয়াছে। একবার রামনগরের মহারাজা কাউন্সিল হাউস হইতে বাহির হইতেছেন, সে কোন্ বারান্দার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল, একেবারে তাহার গা ঘেঁষিয়া মহারাজা চলিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ মহারাজের হাতের সোনা-বাঁধানো বেতের গুঁতা তাহার গায়ে সামান্য ভাবে লাগিতেই খোদ মহারাজা স্বয়ং তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন—ও, আই য়্যাম সো সরি!—আজও তাহার কানে কথাগুলি লাগিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সেখানে কি জন্যে গিয়েছিলে?

—বা রে, দাদাবাবু তো সেখানেই টাইপিস্ট ছিলেন, দেখা করতে গিয়েছিলাম যে ওঁর সঙ্গে।

বলিলাম—বাঃ, তুমি তাহলে তো অনেক বড় বড় লোক দেখেছ!

ছোকরা উৎসাহের সুরে বলিল—তা আপনার আশীর্ব্বাদে সার, অনেক দেখেছি। আজই পড়ে আছি এই অজ পাড়াগাঁয়ে। আই হ্যাভ সীন মেনি মেনি বিগ পিপ্‌ল্—সেই জন্যে আমার ভাল লাগে না এসব জায়গা।

এই সময় একটি বিধবা স্ত্রীলোক একখানা কাঁসার থালায় দু পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া আমাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচবোধ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোকরা বলিল—এস না, দিয়ে যাও। ইনি পশুপতিবাবুর আত্মীয়। লজ্জা নেই, নিয়ে এস।

তবুও মেয়েটি না নড়াতে আমি বলিলাম—তুমি গিয়ে নিয়ে এস।

চা খাইতে খাইতে সুরেশ বলিল—আমার একটু ভাল লোকের সঙ্গে কথা বলবার ঝোঁক আছে চিরকাল। তা এই সব জায়গায় আপনি কোথায় পাবেন বলুন। সব মুখ্যু, নো ওয়ান ইজ ইভ্‌ন্ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্। দুটো ভাল কথা বলি এমন মানুষ নেই। মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।

—সময় কাটাও কি করে?

—বাড়ীর কাজ করি। বাজারে যাই, নবীনদের বাড়ী এসে মাঝে মাঝে বসি। তা নবীন বরং ভাল, দুটো ভাল কথা শুনতে চায়। ওকে সেদিন বললাম, তোরা এখানে কেমন করে থাকিস? আমি দেখেছি কলকাতায় বড় বড় লোকের বাড়ী আলাদা নাইবার ঘর আছে, তাকে বাথ-রুম বলে। গরম জল, ঠাণ্ডা জল। মেদিনীপুরের জমিদারের রতন ষ্ট্রীটে যে বড় বাড়ী আছে দেখেছেন? একবার আমি তাঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। দোতলায় বাথ-রুম। বাড়ীখানা কি! বাথ-রুমে একখানা আয়না আছে, সমস্ত শরীর একসঙ্গে দেখা যায়. মেঝেতে আপনি কেন মুখ দেখুন না, এমনিই সুন্দর করে পালিশ করা। সকালবেলা গিয়েছিলুম, বাবুর জন্যে খাবার গেল—চেয়ে চেয়ে দেখলাম, ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর দুটি রসগোল্লা, দুটো কলা। আমাদের একমুঠো চাল ভাজা, তাও সবদিন জোটে না সকালে উঠে। তাই নবীনকে বললাম—তোরা বেঁচে আছিস ভূতের মত।

মানুষে এমন করে বাস করে না। মানুষের মত বাস করতে হলে কলকাতায় গিয়ে দেখে আর।—আপনি কি বলেন দাদা?

কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, সুতরাং বলিলাম—সে কথা খুবই ঠিক। এসব জায়গায় বর্ষাকালে থাকা অসম্ভব। যেমন কাদা তেমনি মশা। চাহিয়া দেখিয়া বেশ আমোদবোধ করিলাম, বেশ জায়গাতে বসিয়া চা পান করিতেছি বটে! গ্রাম্য শেওড়া ভাট শিউলি গাছের জঙ্গলে ঘেরা একখানা চালাঘরে মাটির মেঝেতে বিচুলি বিছাইয়া আংটা-ভাঙা পেয়ালায় কাপালীদের বাড়ীর তৈরি চা খাইতে খাইতে দুজনে কলিকাতার সুখ-সুবিধার কথা আলোচনা করিতেছি!

ছোকরাও বোধ হয় একই কথা ভাবিতেছিল। কারণ সে এই সময় হঠাৎ বলিল—কতদিন কলকাতায় যে যাই নি! ঐ যেদিন, বললাম না কুণ্ডু য়্যাণ্ড সন্স্, পুলিশক্লাবে যারা খাবার সাপ্লাই করেছিল—প্লাম কেক, স্যাণ্ডউইচ, বিস্কুট, আরও সব মেলা কি কি—ওদের দোকান হল হগ মার্কেটে, কুণ্ডুদের বড় ছেলের সঙ্গে আমার ভাব—তা ওদের দোকানে সকালে বসে আছি, এমন সময় একজন মোটা মত ভদ্রলোক, দিব্যি চেহারা—দোকানে এসে কি চাইলে। কুণ্ডুদের ছেলে বললে—ইনি কে জান? আমি বললাম, না। বললে, মহারাজা অব নাটাগোড়। আমি তো অবাক! বলব কি আপনাকে, আমার গা শিউরে উঠল। কত নাম, কত টাকাকড়ি, খবরের কাগজে কত ছবি বার হয়—এই সেই মহারাজা অব নাটাগোড়, দেখি মহারাজার আরদালি জিনিস নিয়ে গিয়ে, ইয়া বড় মটর দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তুললে। সেসব এক দিন গিয়েছে! এই আমি আর ওই মহারাজা! এখন এখানে বসে বাগদি-দুলে বাড়ী বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি! আজ আপনি এসেছেন, তাই আপনার সঙ্গে দুটো ভাল কথা বলছি, নইলে এতক্ষণ নবীন কাপালীর বাড়ী বসে গল্প করতে হত।

—আহা, তোমার ভগ্নীপতি রাসুবাবু তো অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশেছেন—তা এখন কি করে দিন কাটান?

ভগ্নীপতির উপর দেখিলাম ছোকরার অসীম শ্রদ্ধা। ভগ্নীপতির সঙ্গে কতবার তাঁর আপিসে গিয়া বড় বড় লোক দেখিয়াছে—ইডেন গার্ডেনের পাশে প্রকাণ্ড বাড়ী, এই বড় থাম,—আবার ছোকরা স্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

এই সময় কাপালীদের বাড়ী হইতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পূর্ব্ববৎ দূরে দাঁড়াইল। ছোকরা বলিল—পান নিয়ে এসেছে। চায়ের এগুলো দিয়ে আসি আর পান আনি।

একটা কাঁসার বাটিতে চার খিলি পান লবঙ্গ দিয়া মুড়িয়া পরিপাটি করিয়া সাজা। ছোকরা বলিল—আমি পান খাই নে—আপনি খান।

তার পর আবার আমরা গল্প শুরু করিলাম। দেখিলাম ছোকরার অদ্ভুত ধরনের ক্ষমতা তার নিজেকে প্রতারণা করিবার। তার বর্ত্তমান অবস্থাকে সে কেমন চমৎকার ভুলাইয়াছে ভবিষ্যৎ ও অতীতের সুখস্বপ্ন দ্বারা।

—চাকরি আমার হয়ে যাবে এই জানুয়ারি মাসে। আমার অনেক বড় বড় সহায় আছে

কলকাতায়। এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। একটা ভাল লোকের মুখ দেখতে পাই নি আজ তিন বছরের মধ্যে।

একথা তাঁহাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করি নাই, এতই যদি তাহার সহায়, তবে আজ তিন বছর এখানে পড়িয়া থাকিয়া ভগ্নীপতির বাজার-সরকারি করিতেছে কেন?

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন চৈত্র মাসের দুপুর রোদে দেখি সে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বাজার হইতে প্রকাণ্ড একটি ভারী মোট ঝুলাইয়া আসিতেছে। খালের ধারে আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়া মোট নামাইয়া গাছের ছায়ায় একটু বসিল। বলিলাম—এতে কি?

—হাট-বাজার করে ফিরছি। আটা, ডাল, নুন, এই সব।

—রাসু মুখুজ্যে আজ সকালে বকাবকি করছিলেন কাকে?

—দাদাবাবুর মেজাজ বড় গরম। বাগ্‌দিপাড়ার এক প্রজাকে ডাকতে পাঠালেন, একটু দেরি হয়েছে ফিরতে আমার, আর অমনি বকাবকি শুরু করেছেন।

—তোমার দিদি কিছু বলেন না?

—দাদাবাবুকে দিদি বড় ভয় করে চলে।

ছোকরা চলিয়া গেল। সে রাত্রেই আমার স্ত্রী বলিলেন—আচ্ছা, রাসু মুখুজ্যের শাশুড়ি এখানে থাকেন কেন?

—তা কি করে বলব?

—বড় ভাল লোক। এমন হাতের রান্না! আমায় বিকেলে আজ জলখাবার খাইয়েছিলেন। যেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা—বাবা, রাসুবাবু ওঁর শালাকে যা বকলেন আমার সামনে! বাজার থেকে কি জিনিস ভুলে আনে নি। একেবারে নন্‌সেন্স, বেরিয়ে যাও, বসে বসে গিলছ! এমন সব যা তা বললেন, মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—মুখুজ্যে মশায়ের স্ত্রী কিছু বললেন না?

—ও বাবা, তিনি ভয়ে কাঁটা! মানে, একটু কিন্তু-কিন্তু মনেই হয় তো? এই বাজারে মনে ভাব, মা ভাই সংসারের গলগ্রহ তো? আচ্ছা, কেন ছেলেটিকে বল না কোথাও গিয়ে কিছু করতে? এর চেয়ে যে, বেরিয়ে গিয়ে যা হয় একটা কিছু করাও ভাল। যতদূর বুঝলাম মায়ের মনে খুব দুঃখু। জামাইয়ের ভাত গলা দিয়ে নামে না।

শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম কালই ছোকরাকে বুঝাইয়া বলি। অল্প বয়স, এই তো জীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুঝিবার সময়; সারা-জীবন তার সামনে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রসর হোক বীরের মত—তবে তো সে নিজেকেও খুঁজিয়া পাইবে। এ বাঁচা তো জড় পদার্থের অচলত্ব, ইহা তাহাকে বুঝাইতেই হইবে।

পরদিন তাহার সঙ্গে আবার দেখা। সে নিজেই আমাকে বলিল—দেখুন, একটা কাজ

পাচ্ছি এখানেই বাড়ী বসে—নেব? কাপালীপাড়ার সবাই বলছে গ্রামের বারোয়ারী ঘরে একটা পাঠশালা খুলতে। ছাত্র-পিছু চার আনা দেবে। বিশ-পঁচিশটে ছাত্র আপাতত হবে। তার পর ওরা আরও জোগাড় করে দেবে বলেছে। কি বলেন? ভাল হবে?

—বসে না থেকে ভালই, যা পাও। তোমার পক্ষে বসে থাকাটা—

দিন কয়েক পরে বারোয়ারী ঘরের দিকে বেড়াইতে গিয়া দেখি ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে শটকে' পড়িতেছে—

দুয়ের পিঠে সাত দিলে সাতাশ হয়,
সাতাশের সাত নামে হাতে দুই রয়।

আমাকে দেখিয়া সুরেশ বলিল—আসুন সার, বসুন একটু।—সাতটি ছাত্র আর এই চারটি ছাত্রী জুটেছে—আরও অনেক আসবে বলেছে সামনের মাস থেকে। নবীন, সাধু বাগ্দী, হরি কলু এরা সব ভরসা দিয়েছে।

আমি কিন্তু খুব ভরসা পাইলাম না। ছোকরা যে রকম খুশির সুরে পাঠশালাটিকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার উপর বড় মায়া হইল। এই অতি সামান্য মোচার খোলায় সে সমুদ্রপারের যে কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কত ক্ষণভঙ্গুর সে সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞ যুবক কিছুই জানে না। পাড়াগাঁয়ের পাঠশালা! এইসব ধেড়ে ছাত্রেরা গরু চরাইত, লেখাপড়ায় ইহাদের মন নাই। দুর্গন্ধ মলিন বস্ত্র পরিয়া ভাঙা শেলেট ও কোণ-কোঁকড়ানো প্রথম ভাগ হাতে এই বয়সে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছে, তাহার কারণ—এখন মাঠে মাঠে ধান, গরু চরাইবার সুবিধা নাই—ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটিবার পর যেমন মাঠ ফাঁকা হইয়া যাইবে, ইহাদেরও ছাত্রজীবন সাঙ্গ হইয়া রাখাল-জীবনের শুরু হইবে। পাড়াগাঁয়ের ধাত জানিতে আমার বাকি নাই।

সুরেশ আমার কাছে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বি এ পাশ করে চাকরি করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আপনি দেখুন হিসেব করে, এরা দেবে চার আনা করে মাথা পিছু—পঞ্চাশটি ছাত্র হলেই পঞ্চাশ সিকে অর্থাৎ সাড়ে বার টাকা। তাছাড়া এরা ধানের সময় ধান দেবে, ক্ষেতে ডাল হলে ডাল দেবে, কলাটা মুলোটা—। বাড়ীর খেয়ে এ যে-কোন চাকরির চেয়ে ভাল। আমি কেবল ভাবছি এ আমি এতদিন করিনি কেন।

—রাসু মুখুজ্যে মশায় কি বলেন?

—তিনিও বললেন বাড়ী বসে না থেকে ও খুব ভাল। আচ্ছা, ইন্‌স্‌পেক্টরের আপিসে লিখলে কিছু গ্র্যাণ্ট পাওয়া যাবে না? মর্গ্যান সাহেবকে আমি ধরতে পারি গিয়ে। মর্গ্যান সাহেবের সঙ্গে ডি. পি. আই-এর খুব আলাপ। দাদাবাবুর মামাতো ভাই মর্গ্যান সাহেবের আপিসে কাজ করে—তাকে দিয়ে ধরাতে পারি মর্গ্যান সাহেবকে।

—কে মর্গ্যান সাহেব?

—ক্যালকাটা ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজার। নাম শোনেন নি? মস্ত লোক।

—তুমি তাকে দেখেছ নাকি?

ছোকরা আমার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল—আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, দাদাবাবুর মামাতো ভাই তো সেই অফিসে কাজ করেন, আমি একবার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে! ঢুকতেই বাঁ দিকের যে বড় ঘর, মাইকার পর্দ্দা বসানো কাটা দরজা ঠেলুন, এমন স্প্রিং লাগানো আছে, তখনই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই ঘরে মর্গ্যান সাহেব বসেন। আমি ফাঁক দিয়ে দেখি এমনি মোটা চুরুট খাচ্ছে! আচ্ছা ওসব চুরুটের দাম কত?

—অনেক। আচ্ছা, তুমি স্কুল কর আমি আসি বেড়িয়ে।

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। স্কুল উঠিয়া গেল দু মাসের মধ্যে। যতদিন টিকিবে ভাবিয়াছিলাম, ততদিনও টিকিল না। একদিন দেখি সুরেশ বেলা একটার সময় বাড়ীর পাশের কাঁচকলার ঝাড়ে কোপ মারিয়া গাছ কাটিতেছে।

বলিলাম—স্কুলে যাও নি?

—ইয়ে—স্কুল উঠে গেল।

—সে কি! কেন?

—ছাত্র হল না। দু মাস দেখলাম, তার পর কেউ মাইনে দেয় না। ভূতের বেগার আর কতদিন খাটি বলুন। চাষার ছেলে, ওরা স্কুল-কলেজের মর্ম্ম কি বুঝবে বলুন দেখি। নিউটন বলেছেন—আমি সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সার আইজাক নিউটন—একজন কত বড়দরের সাহেব, ভাবুন তো—এদের সেসব কথা বুঝিয়ে লাভ কি। মরুক গে, আমার ও ভূতের বেগার না খেটে—

রাসু মুখুজ্যে আমায় একদিন বলিলেন—ছোঁড়াটা একেবারে ওয়ার্থলেস। একটা কাজে পাঠাও, তিন ঘণ্টা দেরি করে আসবে। ও হয়েছে আমার একটা বোঝা।

—একটা কিছু চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন না ওকে। এ রকম ঘরে বসিয়ে রেখে—

—বসিয়ে রেখেছি কি সাধে! ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিসনে পাশ—ওকে কোথায় ঢুকুই বল তো? বি. এ, এম. এ, এ বাজারে···আমার ঘাড়েই যত—

—কেন, এখানেও খাটে তো কম নয়। হাটে বাজারে যাচ্ছে, জিনিসপত্র বয়ে আনছে—

রাসু মুখুয্যে অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—ওইটেই সবাই দেখে। আমি কি তবে অত বড় ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেব? আমার তো সে অবস্থা নয়। আমি নিজে কত খাটি দেখ তো—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত—

সুতরাং ছোকরার আবার চাকরের জীবন শুরু হইল। গরুর জাব কাটা, গরু মাঠে দিয়া আসা, হাট বাজার করা, আরও সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ছোকরার স্বপ্ন তেমনি মায়াময়, কল্পনা তেমনি রঙিন রহিয়া গেল। বাস্তবকে সে স্বীকার করিতে আদৌ রাজী হইল না।

গ্রীষ্মকাল কাটিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম সেই যে ভীষণ বর্ষা পড়িল, শ্রাবণ মাস যায় যায় সে বর্ষার বিরাম বিশ্রাম নাই। চারিধার জলে ডুবুডুবু, রাস্তাঘাট কাদায়, হাবড়, বন জঙ্গলে

উঠান ঢাকিয়া গেল। আমার স্ত্রী বলিলেন—ওগো, কলকাতায় সবাই ফিরছে, চল আমরাও যাই—এখানে আর থাকা যায় না। মরি, সেখানে বোমা খেয়ে মরব। ভিজে কাঠে উনুন ধরিয়ে আর ফুঁ পেড়ে চোখ কানা হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে, এ আর সহ্য হয় না।

অতএব চলিয়া আসিলাম কলিকাতায়।

আশ্বিন মাসের প্রথমে এই সেদিন ভগ্নীপতির অসুখ উপলক্ষে একবার সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। স্টেশনে নামিয়াই সেদিন ভীষণ বর্ষা। অতি কষ্টে সাত মাইল হাঁটিয়া প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামের মাঠে পৌঁছিলাম। তখনও সমানে বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া। হঠাৎ চাহিয়া দেখি সেই দুর্য্যোগের মধ্যে সুরেশ এক বোঝা কাঁচা ঘাস মাথায় করিয়া কোথা হইতে আসিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—সুরেশ যে! এত বাদলায়—

সুরেশ আমাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছে তাহার ধরন দেখিয়া বুঝিলাম। কতকটা কৈফিয়তের সুরে বলিল—এই বাদলায় গরুর খাবার নেই কিছু একেবারে। খালপারের মাঠ থেকে দু বোঝা কাঁচা ঘাস···আমি বলি, যাই নিয়ে আসি, দিদি বারণ করেছিল।

সাহস দিয়া বলিলাম—বেশ তো, ভালই তো। নিজের কাজ নিজে করবে এর মধ্যে কিছু ···খুব ভাল। ছোকরার এতটা অভ্যাস নাই, দেখিলাম তাহার রীতিমত কষ্ট হইতেছে। ভগ্নীপতির অন্নদাস, না করিয়া উপায়ই বা কি। রাসু মুখুজ্যে বসিয়া খাইতে দিবে না।

ছোকরা বলিল—কলকাতার অবস্থা কেমন?

—এখন ঢের ভাল। আবার যেমন তেমনিই হয়েছে।

—যুদ্ধের খবর কি? একখানা খবরের কাগজ আসে না যে পড়ি।

—ঐ এক রকম চলছে।

—তাহলে এবার কলকাতায় গিয়ে একটা কাজে লেগে যাই, কি বলেন? বোমার হাঙ্গামা যখন অনেকটা মিটেছে চাকরি একটা জুটিয়ে নেবই। আর্মি অ্যাণ্ড নেভি স্টোর্সের গ্রিফিথ সাহেব আমায় বললে—ইউ আর দি সন অব এ নোবল ফ্যামিলি, গাঙ্গুলি। আই উইল সি ইউ।—সেবার আমায় নিয়ে গিয়েছিল সেখানে—ওই যে কুণ্ডু য়্যাণ্ড সন্স, তাদের মেজ ছেলে কণ্ট্রাক্টর কিনা ওখানকার, তাই। একেবারে স্পষ্ট বললে, আই উইল সি ইউ—

তাহাকে মনে করিয়া দিলাম না যে, সে বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসে নাই, আসিয়াছে তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে। চাকরি এতদিন করে নাই কেন? ছোকরা এখনও স্বপ্নরাজ্যেই বাস করিতেছে—কিছুতেই সে রূঢ় বর্ত্তমানকে স্বীকার করিতে চায় না —আমি তার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিব কেন? তবুও কি জানি ছোকরার উপর কেমন সহানুভূতি ও করুণা হইল।

বেচারী!

অভয়ের অনিদ্রা

অভয়ের সারারাত্রি ঘুম হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না। সেই যে আচমকা কিসের যেন শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল তার পর আর কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। চক্ষু যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বেশ শান্তিতে সে ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ কে যেন তাহার দ্বারে করাঘাত করিয়া গেল। সেই শব্দে অভয়ের সুপ্ত চেতনা জাগিয়া উঠিল। অভয় ধীরে ধীরে তাহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে ক্ষীণপ্রায় হ্যারিকেনটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, ধীরে ধীরে চারিদিকে সাবধানে চাহিয়া দেখিল। না, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য ঘটে নাই। যেখানকার জিনিসটি যেমন ছিল তাহা ঠিক সেখানেই আছে, এতটুকু নড়ে নাই। অভয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভয় তাহার নিশ্চয় অহেতুক। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল হয়তো ডাকাত পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হইল ইহা কলিকাতা, ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই আদৌ। তার পর মনে পড়িল হয়তো চোর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিল। চোরের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তবে কিসের এই বিকট শব্দ? অভয় ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল।

মুহূর্তে তাহার পাশের শূন্য বিছানায় নজর পড়িল। সাতদিন আগে ঐ শয্যা পূর্ণ ছিল। সাতদিন আগে তাহার এ গৃহ এমন মহাশূন্যতা প্রকট করিয়া খাঁ খাঁ করিত না। মনে পড়িল বেচারা বকুলের কথা—তাহার সহধর্মিণী, তাহার স্ত্রী, অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিন বছর পূর্বে এই শ্রাবণের এক শুভলগ্নে বকুলকে সে সগোত্রের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। সেদিনও আকাশে এমনি করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন তাহার মা ছিলেন। দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। তার পর একদা পরপার হইতে মার ডাক পড়িল। বকুল নিপুণ হস্তে সংসারের হাল টানিয়া ধরিল। অভয় তাহার পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। মাতার অভাব বকুলকে দিয়া পূরণ করা হইল। প্রথম প্রথম বকুলকে অবশ্যই বেগ পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু অচিরেই সে অভ্যস্ত হইয়া গেল। সংসারের হিসাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্যন্ত তাহাকে নিজ হস্তে করিতে হইত।

কালক্রমে বকুল স্বামীর বিরাট বহুবিস্তৃত সংসারের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া গেল যে তাহার অভাব একদিনও সহ্য করা যাইত না। বাপের বাড়ী যাইবার ফুরসত সে পাইত না। ভোর হইতে উঠিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মে তাহার বিশ্রাম ছিল না। কলের পুতুলের ন্যায় সে অক্লান্ত কর্ম করিয়া যাইত। একবেলা তাহার অসুখ করিলে সংসার অচলপ্রায় হইয়া যাইত। ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। অতিথি-অভ্যাগত ফিরিয়া যাইত। খাদ্যদ্রব্য এমনই অখাদ্য হইত যে কাহারও মুখে তুলিবার রুচি হইত না। পাশের বাড়ীর চাঁপা একদা মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে বকুলকে দেখিয়া বলিল, দিদির চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেল!

বকুল কহিল, হবে না ভাই ? যা খাটুনি।

চাঁপা কহিল, খাটুনি একটু কম করতে পার !

বকুল মৃদু হাসিল, তাহার মুখে প্রশান্তির ছায়াপাত হইল। সে বলিল, খাটুনি কম করব, কি করে ভাই। নিজের সংসার, পর তো আর কেউ নয়। একটুকু বিশ্রামের ফুরসত নেই। আজ যদি যম আমায় নিতে আসে তাহলে তাকে বলব, একটু বোস, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

চাঁপা কহিল, বালাই ষাট, ওকি অলক্ষুণে কথা ভাই !

বকুল কহিল, আমার আবার লক্ষণ অলক্ষণ ! আমি যমের অরুচি।

এহেন বকুলকে পাইয়া অভয়ের বিপর্য্যস্ত সংসারের মধ্যে বেশ একটা সুশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অভয় বকুলকে নিঃশব্দে চুপিচুপি নাকি ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছিল। কেন না, যে অভয় বন্ধুদের ফেলিয়া একদণ্ড কাটাইতে পারিত না, সেই কিনা বিবাহের পর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির হইয়া গেল। গৃহকেই সে যথাসর্ব্বস্ব জানিয়া ফেলিল। বন্ধুরা বিদ্রূপ করিতে কসুর করে নাই। বলিল, বৌদি তোকে এমন করে তুক করে ফেলবে জানলে কখনও বিয়ে করতে দিতুম না।

কেহ বলিল, বৌদির দেওয়া খাবার-টাবার দেখে খাস বাবা।

কেহ বলিল, কামরূপ-কামিখ্যের ভেড়া হয়ে যাস নে যেন।

অভয় কেবল হাসিতে লাগিল। কাহারও কথায় সে জবাব দিল না।

এমনি করিয়া অভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধুরা ধীরে ধীরে তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহাকে সকলে বিস্মৃত হইল। আপিসের ছুটি হইলে সন্ধ্যায়, বা রবিবারে, কেহ তাহার বাড়ী আর তাশপাশা খেলিতে আসিত না। তাহার বহুদিনের বৈঠকখানা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিল না, বৈকালে ঝাঁট পড়িল না, অভয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, ওরা, আর তাস খেলতে আসে না কেন ?

অভয় মুক্তির হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন বিলাসিতা করবার সঙ্গতি আমার নেই।

বকুল কহিল, এতদিনের অভ্যেস !

—অভ্যেস বলে তো সব-কিছু করা যায় না। পয়সা চাই—চকচকে পয়সা। তাস চাই, আলো চাই, চা চাই, বিস্কুট চাই। পয়সা দিয়ে তো অমন বন্ধুত্ব কিনতে পারি না বকুল। পয়সা কোত্থেকে আসে সে কথা কি কোনদিন চিন্তা করেছ একবার।

কথা শেষে অভয় হা হা করিয়া তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। বকুল বলিল, আমার বিয়ের পর তার এমনি করে যবনিকাপাত করলে আমার লোকে দুষবে, এটা জান তো ?

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, লোকে মনে করবে তাদের এ আনন্দ রুদ্ধ হয়েছে আমারই ষড়যন্ত্রে।

অভয় আবার সেইরূপ সারা ঘরটি কাঁপাইয়া হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, ওঃ! দুষবে তো তোমার? তা যত খুশি দোষ দিক। তুমি তো আর শুনতে যাচ্ছ না। তাতে আর কোন ক্ষতি নেই।

দুই মাস অভয়ের সহিত ঘর করিয়া বকুল বেশ বুঝিয়াছিল যে তাহার স্বামীর হাতটানটা বেশই আছে। হাতের আঙুল নাকি তাহার ফাঁক হয় না! বিবাহের পর এই সুযোগে সে বন্ধু-বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া বসিল। সাবান স্নো কিনিয়া দিতে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, সেকালের দোহাই পাড়িয়া স্ত্রীকে আধুনিকতার বিশেষণে জর্জ্জরিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সেই হারানো যুগের সোনার দিনের বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। বকুলের মুখে আর কোন কথা সরিত না। আর তাহার বলিবারই বা কি থাকিত? তখন তাহার সবে-মাত্র বিবাহ হইয়াছে।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিনটি বৎসর কোন্ ফাঁকে কাটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অকস্মাৎ একদিন বকুলের সামান্য অসুখের সামান্যভাবেই সূত্রপাত হইল। বুধবার রাত্রি দুইটায় সে অভয়কে সহসা ডাকিতে লাগিল। অভয় জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

বকুল বলিল, আমার বড্ড শীত করছে। উঃ হুঃ হুঃ! জানলা দরজা সব বন্ধ করে দাও। আমার ঘাড়ের ওপর লেপ দাও, গায়ের কাপড় দাও, তোশক দাও, গদি দাও, যা কিছু আছে সব দাও।

অভয় লেপ দিল, গায়ের কাপড় দিল। বকুলের শীত তবুও তিলার্দ্ধ কমিল না। সে হি-হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল—আরও দাও, আরও দাও।

দিবার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তথাপি বকুল কাঁপিতে লাগিল। অভয় তার কপালে হাত দিয়া দেখিল গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন এই গভীর রাত্রে সে কি করিবে, করিবার তাহার কিই বা আছে? সে কি ডাক্তার ডাকিবে? ডাক্তারের কথা স্মরণ হইলে তাহার মনে শিহরণ জাগিল। ডাক্তার কবিরাজ ডাকা তো বিলাসিতার নামান্তর। আর রাত্রে নাকি ডাক্তারের ডবল ভিজিট। না, এ সামান্য জ্বরে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। একবার ভাবিল মাথায় আইসব্যাগ দিবে বা কপালে জলপটি দিবে। কিন্তু কোথায় আইসব্যাগ, কোথায় ওডিকোলন! এদিকে বকুল চীৎকার করিতে লাগিল—আমার মাথা জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

অভয় বলিল, বেশ তো ভালমানুষ খাওয়া-দাওয়া করে শুলে। হঠাৎ এমন কিই বা অসুখ করল বল দিকি? এ নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। আমি হলফ করে বলতে পারি এ ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বকুল তখন গান জুড়িয়া দিয়াছে, অনর্গল এলোমেলো বকিয়া চলিয়াছে, সজনি, কি পুছসি··· ঐ যমুনারি কূলে···শ্যাম কালো, তার কালো মাথার চূড়া, তার মোহন বাঁশি···

অভয় বিপদ গণিল। সারারাত্রি স্ত্রীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। নিজের

শরীরের উপর দিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা সে করিতে প্রস্তুত। শুধু এই রাত্রে অযথা সে থামোকা পয়সা খরচ করিতে পারিবে না। পয়সা তাহার বুকের বত্রিশখানা হাড়ের সামিল। বকুল সারারাত্রি হাসিয়া-কাঁদিয়া-গাহিয়া চীৎকার করিয়া কাটাইয়া দিল। জ্বর কমিল না। ভোর হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া হাজির হইল। যথাসময়ে পাড়ার একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, টাইফয়েড। রোগ বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

অভয় প্রমাদ গণিল। বিপদ কি মানুষের এমনি করিয়াই হয়? তাহার বড় ইচ্ছা হইল সে ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু সে কাঁদিল না, বরং স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য জলের মত না বলিয়া না কহিয়া দশটি টাকা খরচ করিয়া বসিল। হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্কটা হয়তো আরও বড় হইবে; কিন্তু স্ত্রী তাহার ভাগ্যবতী, স্বামী-সোহাগিনী, 'পতি পরম গুরু'কে অযথা ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। পরের দিনই সে ইহজগতের মায়া কাটাইয়া গোলোক-ধামে চলিয়া গেল, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিল না।

অভয় পত্নীশোকে ধূলিতলে আছড়াইয়া পড়িল। সে আর্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া রমণীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার অত সাধের তাসের ঘর মরণের তীব্র আঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, কেবল তীব্র সুরে শোক-প্রকাশ করিয়া চলিল। সেইসব পুরনো দিনের হারানো বন্ধুরা আজ বিপদ দেখিয়া আসিয়া জুটিল। সেই হাবু, পটল, রমেন, ভূপেশ, বিপিন—সকলেই একে একে দেখা দিল। দীর্ঘ তিন বৎসর যাহারা অভয়ের ছায়া পর্যন্ত মাড়াইত না, সকালে যাহার মুখ দেখিলে অযাত্রা বলিয়া ঘোষণা করিত, অযথা হাঁড়ি কাটিবার আশঙ্কায় সারাদিন সচকিত থাকিত, আজ সেই অভয়ের বিপদে আর তাহারা, বেচারার হাত দিয়া জল গলে না বলিয়া, দূরে সরিয়া রহিল না। অভয় তাহাদের দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারা অভয়ের কান্না দেখিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা জানে অভয় তাহার স্ত্রীকে কি দারুণ ভালবাসে, স্ত্রীর অভাবে তাহার জীবন কিরূপ বিষময় হইয়া যাইবে। অগত্যা তাহারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় শবদাহ শেষ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল।

সত্যই নাকি অভয় তাহার স্ত্রীকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত। সে ভালবাসায় নাকি এতটুকু গলদ ছিল না। উঠিতে বসিতে সব সময়ে সে 'বকুল' 'বকুল' বলিয়া অস্থির হইত। বকুল হাসিয়া বলিত, আমি মলে তুমি কি করবে বল ত?

—শুভ্র তাজমহল।

বকুল হাসিমুখেই বলিত, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি অত খরচ করো না।

অভয় কহিত, পয়সা-কড়ি তো সবই তোমার। তোমার পয়সা তোমার জন্যে খরচ করব,

তাতে পায়ে পড়ে বাহাদুরি কেনবার কি এমন আছে।

—বেশ, মানলুম সমস্ত পয়সাকড়ি আমার, আমার কলকাতা শহরে চোদ্দখানা বাড়ী, তার মাসিক আট শ টাকা ভাড়া। এখন আপাতত দয়া করে আমার জন্যে একখানা লালাবাই সাবান এনে দাও দিকি।

অভয় তাহার স্ত্রীকে প্রবোধ দিল, পাগল নাকি! ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে? না, ও বিলাসিতা আমাদের এখানে চলবে না।

সেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হইয়া অভয় ছয় দিন ছয় রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। বন্ধুরা সকলে বিপদ গণিল। এই নিদারুণ শোকাবেগের হাত হইতে কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে! সকলে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিরহে কাতর মানুষটিকে সেই বহুশ্রুত দার্শনিক মতবাদ দিয়া বুঝাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। সেই—মানুষ মরণশীল, মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করা নাকি দুর্ব্বলতার লক্ষণ, রাজর্ষি জনকের নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত, সরিষা আনিবার জন্য বুদ্ধের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মরাজ বকের প্রশ্ন—ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ কথায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। অভয় তবুও প্রথমটা ভোলে নাই।

ছয় দিন ছয় রাত্রির পর আজ সবে সে পত্নীশোক কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়া সামান্য ঘুমাইয়াছে এহেন সময়ে সেই বিকট শব্দ হইল। অভয় একদৃষ্টে বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া রহিল। বুকখানার ভিতর হু হু করিয়া উঠিল। ডাকাত নয়, তবে চোর হইলে হইতে পারে।

কিন্তু চোর বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না।

তবে এ কিসের শব্দ? অভয় দরজার একটি গর্ত্ত দিয়া দেখিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশের মাঝে উজ্জ্বল চাঁদ সাদা, দীপ্তিময়ী তারকারাশি। অভয় বিছানায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিসের এ শব্দ?

আচমকা মনে পড়িল হয়তো তাহার মৃত স্ত্রীর কীর্ত্তি, হয়তো বেচারা এ জগতের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই। তাই কি নিঃশব্দ রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে? তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাহার গা ডোল হইয়া শিহরিয়া উঠিল। না, স্ত্রীর এই উৎকট ভালবাসা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে লাগিল। বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিবার সাহস আর তাহার রহিল না। সমস্ত শোক-দুঃখ-বেদনা ভয়ে ও ভাবনায় রূপান্তরিত হইল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শয্যার উপর অবশ ভাবে বসিয়া রহিল। কি সে করিবে? চিৎকার করিবে, না জ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে? ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। সে ছেলেবেলায় কত ভৌতিক কাহিনী পড়িয়াছে, আজ কেমন যেন সেই সব নানা ভৌতিক ব্যাপার জীবন্ত হইয়া উঠিল। সে বন্ধ জানালা-দরজার পানে সচকিত চিত্তে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কে জানে কোন্ মুহূর্ত্তে দমকা বাতাসে জানালা-দরজাগুলি হুড়মুড় করিয়া খুলিয়া যায়।

অকস্মাৎ আবার সেই পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারে শব্দ হইল। বাহির হইতে মানুষে যেন দ্বার ঠেলিতেছে। অভয় ছুটিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া সেই ফুটা দিয়া বাহিরে তাকাইল। কিন্তু আশ্চর্য্য, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিল একটি হৃষ্টপুষ্ট ভিটামিনের মাপকাঠির চিহ্নস্বরূপ পাঞ্জাবী ইঁদুর হুন্‌হুন্ করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়িয়া পলাইয়া গেল।

বিপুল বিস্ময়ে অভয়ের মুখে কোন কথা সরিল না, কেবল তৃপ্তি ও প্রশান্তির হাসি খেলিয়া গেল। যাহা হউক, যদি ডাকাতই পড়িত বা চোরই আসিত! কতদিন হইতে সে ভাবিয়াছে গহনাপত্র পয়সা-কড়ি অন্যত্র সাবধানে রাখিয়া দিবে, কিন্তু ফুরসত পায় নাই। তাই আজ গুপ্তস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিবে তাহার সবকিছু মজুত আছে কিনা। ধীরে ধীরে সে সিন্দুক খুলিয়া ফর্দ্দ মিলাইয়া তাহার সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। ফর্দ্দ মিলাইতে মিলাইতে তাহার তৃষ্ণা পাইয়া গেল। ভাবিল বকুলকে জল আনিতে বলে, হয়তো বলিতও তাহাকে, যদি-না তৎক্ষণাৎ মনে পড়িত তাহার মৃত্যুর কথা। না, একটা চাকর ও একটা ঝি না রাখিলে চলিবে না। বকুল আসিয়া পর্য্যন্ত সে উহাদের বিদায় করিয়াছিল; কিন্তু আজ তো তাহাদের না হইলে অভয়ের আদৌ চলে না। কম করিয়াও খাওয়া-পরা বাদে তাহাদের জন্য অভয়কে মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, বৎসর শেষে এই দশটি টাকা আবার এক শ কুড়ি টাকায় পরিণত হইবে! বাৎসরিক মোটা অঙ্কটা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাত্রি দুইটা বাজিল। অভয় তখন বাক্স হাতড়াইতেছে। তাহার চুল উস্কো-খুস্কো হইয়া গিয়াছে, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ঘন ঘন অস্বস্তির নিশ্বাস পড়িতেছে। গভীর রাত্রেই সে স্ত্রীর শূন্য শয্যায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আবার সে বিনাইয়া বিনাইয়া চাপা-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ফটোখানার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ফটো দেখিয়া বকুলকে চেনা মুশকিল। কোন্ মান্ধাতার আমলে ঐখানি তোলা হইয়াছিল। তার পর ফটো তুলিবার প্রয়োজন বা সদিচ্ছা আর তাহার হয় নাই।

দুইটা তিনটা করিয়া রাত্রি ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ের চোখে তখনও ঘুম নাই। তখনও সে তাহার দীর্ঘ চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। হয়তো সে পত্নীশোকে বিবশ হইয়া গিয়াছে। শয্যা হইতে উঠিয়া অভয় ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিল। চাঁদ অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারায় তারায় সারা আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর সহসা হু হু করিয়া উঠিল। কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। ঘুম দূরের কথা, সে তাহার বিছানায় শুইতেই পারিল না। শয্যা তাহাকে কাঁটার ন্যায় বিঁধিতে লাগিল।

একবার ভাবিল যে লোটাকম্বল লইয়া যেখানে দুচোখ যায় সেখানে চলিয়া যাইবে? আর সে সংসার করিতে পারে না। সে হয়তো পাগল হইয়া যাইবে। পাগল হইবার তাহার বাকিই বা কি আছে। "বিপদ যখন আসে তখন সে তো আর একা একা চুপি চুপি আসে না। এমন করিয়া অঘটন ঘটিলে সে কি করিয়া বাঁচিবে?

আজ সে যে-শোক পাইয়াছে তাহার কাছে তাহার মৃত্যুজনিত শোক সম্পূর্ণ তুচ্ছ। স্ত্রীর শোক সে ভুলিতে পারে; কিন্তু এ শোক তো সে কখনও কোন কালে ভুলিতে পারিবে না। গত ছয় দিন ছয় রাত্রি এই দারুণ উদ্বেগে কাটিয়াছে, যতটা স্ত্রীর বিরহে না হউক, তাহার বেশি ওই বৎসরে এক শ কুড়ি টাকা খরচের ভয়ে। সেই ভয়েই তাহার ছয় দিন-ছয় রাত্রি ঘুম হয় নাই। বকুল ছিল সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার মৃত্যুতে সংসার একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে; কি দিয়া অভয় সে সংসারকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অভয় আজ ছয় দিন ধরিয়া হদিস পায় নাই। স্ত্রী মানুষের মরে, অভয়ের তাহাতে তত দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ যে কথা আছে, ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে—তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অভয় ভাগ্যবান হইল কই?

স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার আদৌ দুঃখ নাই। সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ্দ মিলাইয়া দেখিল। না, সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয়? লোকসানের পর এমন করিয়া লোকসান হইলে সে কি করিয়া সহ্য করিবে? না, এই লোকসান সহিয়া সে কখনও সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। গহনার বাক্সটির পানে সে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীর ব্যবহৃত গহনার সব কিছুই আছে, সব কিছুই সে নিপুণ হস্তে মৃত বকুলের গা হইতে খুলিয়া লইয়াছে। কাশী হইতে তাহার ছোট বোন সেই যে কারুকার্য্যখচিত কাচের চুড়ি চারগাছি পাঠাইয়াছিল, সেগুলিও সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে। সব তুলিয়াছে, কিন্তু ভুল করিয়াছে বকুলের কানের ফুল দুটি খুলিতে! এক আনা সোনা দিয়া সে-দুটি সে গড়াইয়াছিল। চুলের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সে-দুটি শবদেহের সহিত গিয়া চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে।

সেই কারণে অভয়ের আজ সারারাত্রি ঘুম হইল না। স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া? যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল দুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়। আর অভয় কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?

অসমাপ্ত

কোন্নগরে সাহিত্য-সভা করিতে গিয়াছিলাম।

আমিই সভাপতি। টানা মোটরে কলিকাতা হইতে আমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সভাস্থলে পৌঁছিয়া বেজায় খাতির, কলিকাতা হইতে সমাগত আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত পুষ্পমাল্যশোভিত আমারও ফটো নেওয়া হইল স্থানীয় উৎসাহী সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত তরুণদের দ্বারা।

—এইবার আসুন, একটু জলযোগ—

—সভা কখন? সময় হল তো—

—সভার আগে সামান্য একটু চা—

বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—চল হে তবে। ওঁরা যখন নিতান্তই ছাড়বেন না—

—আসুন এদিকে—ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, এখানকার জমিদার—

—ও! নমস্কার! হেঁ—হেঁ—

একগাল হাসিয়া রায় বাহাদুর প্রতিনমস্কার করিলেন।

—গরিবের বাড়ীতে—সামান্য একটু—হেঁ হেঁ—। আপনার নাম অনেকদিন থেকে শোনা ছিল। আজ বড় সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হল। আপনার শাপমোচন পড়ে আমাদের বাড়ীর এরা কেঁদে বাঁচে না। আমি এখনও পড়ি নি। সময় পাই নে, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বড় বেশি—যদিও রিটায়ার করেছি, তবুও কাজের অন্ত নেই।—ওঁরই নাম বিনয়বাবু? আসুন আসুন, আপনার বইও—মানে, পড়ি নি—তবে নাম কে না শুনেছে আপনাদের বাংলা দেশে, বলুন!

আমরা সবাই খ্যাতির গর্বে স্ফীত হইয়া উঠি।

প্রকাণ্ড ঘর। মাঝখান জুড়িয়া লম্বালম্বি একখানা বড় টেবিল সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা—চার পাঁচটা ফুলদানিতে ফুল সাজানো। বড় বড় চীনামাটির প্লেটে সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি ও রসগোল্লা। কাচের গ্লাস সারি সারি ও কাচের জগে জল। চায়ের সরঞ্জাম।

—আসুন, বসুন—এই যে, আপনি এইদিকে—বিনয়বাবু এখানে। ওরে ফল কই? এখনও কাটা হয় নি? কখন আর কাটবি? নিয়ে আয়।···ওহে সুশীল, তোমরাও বসে পড়, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব? কেনারাম কোথায় গেল? ডেকে নিয়ে এস। বাঃ, চা খেয়ে নাও সকলে একসঙ্গে—না না, দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।

—ওই ছবিখানা কার? বেশ সুন্দর চেহারা—

—আজ্ঞে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের! ফ্রেঞ্চ গভর্নমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন—একেবারে ডান হাত বা বাঁ হাত। আর ওই বাঁ পাশে আমার পিতামহ। আমাদের আদি বাড়ী শশধরপুর, নিমতের কাছে। আমার ঠাকুরদাদার বাবার নামে গ্রামের নাম—নিমকির দারোগা ছিলেন

সেখানে। ওই অঞ্চলে জমিদারী কেনেন—ওরে সিঙাড়া আরও নিয়ে আয়—খান খান—গরম সিঙাড়া—সব বাড়ীতে তৈরি—দোকানের জিনিস মশাই এ বাড়ীতে ঢোকে না। আমার বড়বৌমার হাতে ভাজা সব। বড় ছেলে? সে এখানে নেই—কাস্টমস্-এ কাজ করে—এবার আড়াই-শ-হল—বিয়ে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর—তার শ্বশুরও জমিদার—রায় সাহেব হরিনাথ বাঁড়ুজ্যে, হালিসহরের—নাম শুনেছেন বোধ হয়? চা দিয়ে যা এবার—

একটি বার-তের বছরের সুশ্রী বালিকা পান লইয়া আসিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে দরজার নিকট দাঁড়াইল।

—কি ওতে রে খুকি? পান? রাখ এখানে রাখ—এইটি আমার ছোট মেয়ে মিনতি। লজ্জা কি এঁদের কাছে। বেশ গান গায়, আজ সভাতে গাইবে এখন। আবৃত্তিতে আর বছর মেডেল পেয়েছিল—জলধর সেন শুনে কেঁদে ফেললেন একেবারে—

কর্তব্য ও শোভনতার খাতিরে খুকিটিকে কাছে ডাকিয়া দু-একটি মামুলি ছেঁদো কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার আবৃত্তি পুনরায় আমাদের কাছে করিবার জন্য জিদ ধরি, এবং পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করি—তাহলে ওঠা যাক সব—কি বলেন? সভার টাইম তো হল—

—ওরে কানাই, গাড়ীখানা আনতে বল্ চট করে, গেটের কাছে নিয়ে আসুক—

—না না, গাড়ী কি হবে। দরকার নেই রায় বাহাদুর। হেঁটেই এটুকু—

—বিলক্ষণ! ক্লাব ঘর এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন, গাড়ী যখন রয়েছে—নিয়ে আয় রে—বলে দিলি না গাড়ীর কথা?

সদলদলে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় একটি আট ন বছরের বালক পিছন হইতে আমায় ডাকিয়া বলিল—মা আপনাকে ডাকছে—

প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম আর কি। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলাম—কাকে? কে ডাকছেন বললে খোকা?

বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাকে মা ডাকছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ আমি এ স্থানে পূর্বে কখনও আসি নাই, বালকটি আমায় কখনও দেখে নাই ইহা নিশ্চিত। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা?

আর একজন বলিলেন—আরে ও তো আমাদের হরিজীবনের ছেলে। তুমি হরিজীবনের ছেলে না? হ্যাঁ। ওই দোতলা বাড়ী। এঁকে ডাকছেন তোমার মা? এই বাবুকে?

বালক চারিদিক হইতে জেরায় একটু দমিয়া গিয়া সঙ্কোচের সুরে বলিল—এই বাবুকেই তো মা বললেন ডাকতে। মা বললেন—যিনি চাদর গায়ে গাড়ীতে উঠছেন—

—যান মশায়, দেখে আসুন। ওর বাবার নাম হরিজীবন মুখুজ্যে, রেলে কাজ করে, আমাদের এখানে বাসা। চিনতে পেরেছেন? হরিজীবন এখন বাড়ী নেই, বোধ হয় ডিউটিতে

গিয়েছে। তোমার বাবা বাড়ী আছেন খোকা?

বুঝিতে পারিলাম না কে হরিজীবন। কিন্তু এই বালকটির মুখের আদল আমার অত্যন্ত পরিচিত মনে হইল, যেন পূর্ব্বে এ ধরনের মুখ কোথায় দেখিয়াছি।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই দরজার আড়াল হইতে যে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ইহাকে তো চিনি! অনেক দিন আগে ইহার সহিত খুব জানাশোনা ছিল। কিন্তু নাম কিছুতেই মনে আনিতে পারিলাম না। মেয়েটি আমার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কি যতীনদা, চিনতে পারেন? কে বলুন তো?

—এস এস—থাক্। কল্যাণ হোক। ভাল আছ বেশ? সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাণপণে মেয়েটির নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে পড়িল ইহার সঙ্গে আলাপ হইবার একমাত্র সম্ভবপর স্থান হইতেছে কৃষ্ণনগর, যেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িয়াছিলাম—অন্য কোথাও মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই। কিন্তু ষোল-সতের বৎসর পূর্ব্বের সেই দিনগুলিতে, ভাবিয়া দেখিলাম অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল শুধু এই কারণে যে, আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম সে বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চ্চা উপলক্ষে পাড়ার অনেক মেয়ে জড় হইত। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, ছোট ছোট মেয়েদের থিয়েটার প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের সাহায্য করিতে অনেকবার অনুরুদ্ধ হইতাম—সে উপলক্ষেও অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম! সেখানেই যদি ইহার সহিত দেখাশুনা হইয়া থাকে তবে নাম মনে আনিবার চেষ্টা বৃথা। কারণ their name is Legion.

—বসুন যতীনদা।

—ইয়ে—গিয়ে, বসব বটে, কিন্তু ঘুরে আসি, সভা রয়েছে কিনা? সভার টাইম প্রায় হয়ে গেল।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—উঃ, আপনি আবার সাহিত্যিক হয়েছেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। উঃ কি বখাটেই ছিলেন!

চুপ করিয়া রহিলাম—যদিও ঠিক বুঝিলাম না আমার মধ্যে বখাটেগিরির কি দেখিয়াছিল এ। এবং আমার তো মনে হয় না আমি সত্যিকারের বখাটে যাহাকে বলে, তাহা ছিলাম কোনদিন। কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার ইহা সময় নয়।

মেয়েটি আবার বলিল—কতদিন ভেবেছি আপনি কোথায় চলে গেলেন, আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না! কিন্তু ভগবান দেখা করিয়ে দেন এমনি করে।

আমি এবার ইহাকে অনেকখানি মনে আনিতে পারিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিলাম—তোমার নাম শান্তি না?

মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি?

বলিতে পারিলাম না যে, সন্দেহ তো দূরের কথা, নামটাই মনে ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু এবার ইহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি। আজ পনের-ষোল বছর আগে ইহার সঙ্গে আলাপ হইয়া-

ছিল—তার পর আর কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে অতগুলি মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটির ব্যবহার ছিল সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিক ও সরল, তখনকার মনোভাবে আমি ইহাকে সেইজন্যে আমল দিই নাই—গায়েপড়া বলিয়া মনে করিতাম।

শান্তি বলিল—আপনি আজকাল থাকেন কোথায়?

—কলকাতাতেই আছি আজ আট ন বছর। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন?

—বহুদিন।

—ছেলেপিলে হয়েছে?

—চার মেয়ে। আর কিছু শুনতে চাও?

—বাজে কথা। আপনি কক্ষনো বিয়ে করেন নি।

—এ কথা ভাববার হেতু কি?

—আপনাকে আমি খুব ভালই জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সত্যি কি না?

হাসিয়া ফেলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভালও লাগিল। পনের বছর পূর্ব্বে এক-আধ বছরের জন্য যে মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ধরনের আলাপ হইয়াছিল তাহাকে আমার চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া ভাল লাগিবার কথা বটে। এ এমন এক ধরনের আত্মীয়তা যাহা অন্য কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না, বা অন্য কোনও ধরনের ব্যবহার দ্বারা ইহার স্থানও পূর্ণ হয় না।

বলিলাম—ধরে যখন ফেলেছ শান্তি, তখন মিথ্যে বলে লাভ নেই। বিয়ে এখনও করি নি।

শান্তি সগর্ব্বে বলিল—দেখুন, বললাম যে আপনাকে তখনই আমি চিনে ফেলেছিলাম, ঠিক কিনা ভাল করে বলুন এবার।

বলিলাম—তাহলে এখন আসি শান্তি—সভার পরে না হয় আসব এখন একবার। তোমার স্বামী কখন আসবেন? আলাপ হলে বেশ আনন্দ হত। সন্ধ্যের পর? বেশ, আমারও আসতে রাত আটটা বাজবে, বুঝেছ।

—এখানে আজ রাত্রে খাবেন কিন্তু, বলা রইল।

সভার পরে পুনরায় শান্তির ওখানে ফিরিতে প্রায় রাত্রি নয়টা বাজিল। শান্তির স্বামীর সঙ্গে আলাপ হইল—বেশ ভাল লোক। আমার আসিবার খবর শুনিয়া ভদ্রলোক বাছিয়া বাছিয়া বাজার করিয়াছেন, সব রান্না শেষ করিতে শান্তির বেশ সময় লাগিবে—রাত দশটার কমে রান্না সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হইল না। শান্তি চা করিয়া দিয়া গেল। আমি বসিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

একবার শান্তি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?

—ও জিনিসটির প্রাদুর্ভাব তোমাদের আতিথেয়তার কল্যাণে আদৌ হবার উপায় নেই।

এসে পর্য্যন্ত খাওয়া চলছে। তুমি নিরুদ্বেগে বসে রাঁধতে পার যতক্ষণ খুশি।

আহারাদির পরে শান্তি বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। শান্তির স্বামী দু-একবার হাই তুলিয়া বলিলেন—আমার কাল খুব সকালে ডিউটি—যদি কিছু মনে না করেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি—

—বিলক্ষণ! শোবেন বই কি। আমিও তাহলে—

—শান্তি, তুমি বরং বসে গল্প কর। আমি যাই। এঁর বিছানা করে রেখেছ তো? মশারিটা খাটিয়ে দিও।··স্বামী উঠিয়া চলিয়া গেলে শান্তি বলিল—ঘুম পেলে শুনছি নে কিন্তু। আজ সারা রাত বসে গল্প করতে হবে। কতকাল পরে দেখা!

—সারা রাত! বল কি!

হঠাৎ শান্তি বলিল—কেন না? আপনি আমায় কত কষ্ট দিয়েছিলেন জানেন?

আমি অবাক হইয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—কিসের কষ্ট?

—কিসের কষ্ট জানেন না তো? জানবেনই বা কি করে। আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। বলিয়াই সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আনিয়া আমার সামনে খুলিল। একটা পত্র আমার সামনে ধরিয়া বলিল—দেখুন পড়ে।

পড়িয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমার মাসীমা পরলোকে গমন করিয়াছেন আজ দশ বছর কি তার বেশি। তাঁর হাতের লেখা খুব ভাল করিয়াই চিনি। মাসীমা শান্তির মাকে চিঠিতে আমার সহিত শান্তির বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন এই চিঠিতে।

বলিলাম—তুমি এ পত্র পেলে কোথায়?

—যেদিন এ পত্র এসেছিল, সেই দিনটি থেকে পত্রখানা আমার কাছে। আপনিও তার পর আর কখনও আজিমগঞ্জে যান নি। সেই শ্রাবণ মাসে যে চলে এলেন—এই আবার এত-কাল পরে দেখা।

—কিন্তু আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না একথা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে শান্তি?

শান্তি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানতেন না মানে? সব জানতেন।

—কেন বল তো তুমি একথা বলছ?

শান্তি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সব জানি যতীনদা, সব জানি। আমার চোখে আবার ধুলো দেবার চেষ্টা? একবার তো করে দেখলেন, ঠকে গেলেন নিজেই।

—কি চেষ্টা করলুম তোমার চোখে ধুলো দেবার?

—ওই যে বললেন বিয়ে করেছেন, চার মেয়ে হয়েছে। আমি আর জানি নে আপনাকে? বিয়ে আবার আপনি করলেন! কেন বিয়ে করেন নি, তাও কি আমার অজানা ভাবছেন? এক এক সময় তাই মনে হয়েছে, এই ষোল বছরের মধ্যে—যদি কখনও দেখা হয়, পায়ে ধরে আপনার কাছে মাপ চেয়ে নেব। আমি তো গিয়েছিই—আপনি কেন যাবেন সেই সঙ্গে?

—সেই কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম এতকাল পরে।

বিস্ময়ে আমার মুখে কথা যোগাইল না। শান্তি বলে কি! এমন ভুলও মানুষের হয়? সমস্ত কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় নয় এটা—তবুও এক চমকে ইহার মনের অনেকখানিই দেখিতে পাইলাম। সভা করিতে আসিয়াছি বিদেশে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এতখানি দরদ দেখাইবার ঠিকমত কারণ আমি অনেক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া গেল এবার।

কিন্তু মেয়েটি কি ভুলই নিজের বুকের মধ্যে এই ষোল বছর পুষিয়া রাখিয়াছে! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল কতকগুলি কথা জানিবার। বলিলাম—আজ যখন এখানে এলাম, তুমি কি করে আমায় চিনলে এতকাল পরে?

—সভার জন্যে কাগজ ছাপিয়ে বিলি করেছিল—আপনার নাম দেখলাম। তা ছাড়া স্বরজিৎবাবুর ছেলে আপনার পরিচয় সেদিন দিচ্ছিল ওঁর কাছে আমাদের বাড়ী বসে। আমি তখনই ওঁকে বললাম, যতীনদা আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। উনি বললেন, রায় বাহাদুরের বাড়ী আপনাদের চা খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—তাই শুনে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—দেখেই চিনলে এতকাল পরে?

—ওমা, কেন চিনব না! আপনারা আমাদের ভাবেন কি?

এখন ইহাকে ভাল করিয়াই মনে পড়িয়াছে—আমার কিছুদিনের বাল্যসঙ্গিনী একটি অত্যন্ত মুখরা, চঞ্চলা বালিকার ছবি। আবছায়াভাবে ইহার দু-একটি বাল্যলীলাও মনে পড়িতেছে।

বলিলাম—শান্তি, নিতাইয়ের মা সেই বুড়ো গিন্নীর শিব চুরির কথা মনে পড়ে?

শান্তি হাসিয়া বলিল—খু-উ-ব। চুরি করলেন আপনি আর ধনা—ধনাকে মনে আছে? —সে আজকাল পাটের কলে কাজ করে নৈহাটিতে, মধ্যে একদিন এখানে এসেছিল আজ বছর তিন চার আগে—আর গাল খেয়ে মলুম আমি আর ছোড়দি।

—কেন, তোমরা তো সাহায্য করেছিলে, কর নি? পুজোর ঘরের শেকল তুলে দিতে বলেছিল বুড়ো গিন্নী—শেকল তুলে না দিয়ে বলেছিলে, দিয়েছ। আর একদিন তুমি জাঁতি দিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছিলে মনে আছে? কেঁদেছিলে খুব।

শান্তি ছেলেমানুষের মত মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—হ্যাঁ, কেঁদেছিলে খুব! ছাই মনে আছে। কাঁদবার মেয়েই আমি ছিলাম কিনা।

—তবু যদি আমার মনে না থাকত!

—কি মনে আছে শুনি?

—মনে আছে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

শান্তি অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, কি মিথ্যেবাদী!

আমার হাসি পাইল। বলিলাম—ছেলেবেলার মত ঝগড়া পাকিয়ে তুলছ শান্তি! অভ্যেস কি কখনও যায়!

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, যতীনদা—শিবতলার বটগাছে ভারা বেঁধে দিতে তো কি বছর পরীক্ষার আগে—খুলেছিলে কোনদিন ?

সত্যিই অনেক কথা দেখিতেছি মনে রাখিয়াছে শান্তি। আমার নিজেরই মনে ছিল না। মেয়েরা বড় মনে রাখে।

রাত অনেক। শান্তি বলিল—আর না যতীনদা, রাত হয়েছে, শুতে যান। যদিও আমার ইচ্ছে করছে আজ সারারাতটা আপনার সঙ্গে বসে গল্প করি। কাল সকালে উঠেই যেন চলে যাবেন না, খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে—

—কাল তা কি করে হবে শান্তি। কাল সোমবার, সব খোলা—খেয়ে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আমি সকালে চা খেয়েই চলে যাব।

শান্তি কর্তৃত্বের সুরে বলিল—সে হবে এখন। সেজন্যে আপনার ভাবতে হবে না—কাল সকালে উঠে দুটো আপিসের ভাত দিতে আমার আর হাত পা খোঁড়া হয়ে যাবে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম ব্যাপারখানা। শান্তিকে প্রতারণা করিলাম বটে, স্বীকার করি সেটা বড়ই খারাপ কাজ, কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিলেই কি সে খুশী হইত ? ওর জীবনে হয়তো এইটুকু ভাবিয়াই উহার সুখ—কেন সে সুখটুকু নষ্ট করিবে ?

পরদিন সকালে না খাওয়াইয়া শান্তি কি ছাড়ে ! খুব ভোরে উঠিয়া এটা সেটা রাঁধিতে ব স্ত হইয়া পড়িল। সাড়ে আটটায় আমার গাড়ী। তার অনেক আগে সে আমার চার পাঁচ রকমের তরকারি করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আবার কবে আসবেন দাদা ?

—সময় তো পাই নে। তবে—ইয়ে—আসব বইকি।

হঠাৎ খপ করিয়া আমার হাত দুখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না দাদা, আমি সব জানি, সব বুঝি। আপনি যে নিজের জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দিলেন, সেজন্যে আমার মনে দুঃখের আগুন জ্বলে দিন-রাত। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন বলুন ?

—কি অনুরোধ বল শান্তি।

—আপনি বিয়ে করুন—করতেই হবে আপনাকে বিয়ে। আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। বলুন অনুরোধ রাখবেন ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শান্তি আবার বলিল—চুপ করে থাকলে হবে না ! আমার কাছে বলে যান।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি শান্তি।

—বেশ, তা ভাবুন। এইটুকু যে বলেছেন এবার সেই যথেষ্ট। আবার এই মাঘ মাসে সরস্বতী পুজোর সময় আসবেন বলুন ?

—আচ্ছা, তা বরং—

—না, ওসব শুনব না। বরং টরং না, আসতেই হবে বলে দিলাম। আমি পথের দিকে চেয়ে থাকব—

—আসব।'

পথে উঠিয়া দেখি, শান্তি রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

কবি কুণ্ডু মশায়

আজ দশ বৎসর পূর্ব্বে এ ঘটনার প্রথম আরম্ভ। আমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছি বলেই এ গল্প লিখতে বসেছি। পূজোর সময় প্রত্যেক লেখকের কাছেই সম্পাদকের তাগিদ যায় 'মশাই, গল্প দেবেন একটা যত সত্বর হয়।'

এঁরা হলেন পেশাদার গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। হাতে পয়সা না পেলে এঁদের মন ভার হয়ে ওঠে, লেখনীও বিরূপ হয়। 'গল্প আছে, টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।' কেনই বা বলবেন না, লেখকদেরও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে।

খুব বড একটা সাহিত্যসভায় বসে এই কথাটা মনে হয়েছিল। পত্রপুষ্পশোভিত তোরণদ্বার, মস্ত বড মণ্ডপ, বহু বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যামোদী জনগণের সমাগম, আদর-আপ্যায়নও যথেষ্ট। পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা কত কবিযশঃপ্রার্থী হতভাগ্যদের সঙ্গে আমার কতবার পরিচয় ঘটেছে, কোনও সাহিত্যসভায় তাদের স্থান হয়নি কোনদিন। অথচ তাদের মধ্যে প্রকৃত কবিমন, কল্পনার উদার প্রসার, ছন্দের বা কোনও শব্দের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ নয়—কিন্তু তাদের নেই কি, তাও আমি জানি। তাদের নেই বর্ত্তমানের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচনের ক্ষমতা। তাদের দৃষ্টি ১২৯০ সালের বাংলায় পড়ে আছে আজও—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের, দাশরথি রায়ের প্রভাব তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সেবার গরমের ছুটিতে দেশে আছি।

রাত প্রায় এগারটা বাজে, বিছানায় ছটফট করার পরে একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে মাত্র।

—আছেন নাকি শ্যামবাবু?

এত রাত্রে অপরিচিত স্বরে কে ডাকে বুঝতে না পেরে বাইরে এসে বললাম—কোথা থেকে আসছেন?

অন্ধকার রাত। দেখলাম আগন্তুক বিনা আলোয় এসেছে, যেখান থেকেই আসুক। লণ্ঠন জেলে বাইরে আবার গিয়ে আগন্তুকের চেহারা এবার ভাল করে দেখলাম। বৃদ্ধ লোক,

ষাটের কাছাকাছি বয়স, গায়ে আধময়লা পিরান, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—বগলে এক তাড়া বই বা কাগজ।

আগন্তুক বলল—আমায় চিনতে পারলেন না? আমাকে সকলে কুণ্ডু মশাই বলে জানে। বসাকদের কাপড়ের গুদোমে কাজ করি বল্লভপুরের বাজারে। তা আপনারা দেশে ঘরে থাকেন না, গরমের ছুটির পরই চলে যাবেন—চিনবেন কি করে।

কথাটা সত্যি। দেশে থাকলে চিনতাম বই কি—দেশেরই লোক যখন। বললাম—কি জন্যে আসা হয়েছে?

—আপনি একজন রাইটার লোক, আমার লেখা কবিতা কিছু আপনাকে আজ শোনাতে এসেছি।

—ও, বসুন বসুন। সে বেশ কথা। দাঁড়ান একটা কিছু পাতি।

দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলাম। বল্লভপুরের বাজার এখান থেকে দু মাইলের সামান্য কিছু বেশি, এত রাত্রে নিছক কবিতা শোনাতে লোকটা কষ্ট করে এতদূর এসেছে—না, এমন ব্যাপার যে দেখিনি আদৌ একথা বললে ভুল হবে—জীবনে বার কয়েক এ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং আমি এদের ভালও বাসি।

এরা সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক, এরা যশ পায় না, অর্থ তো পায়ই না—লেখার নেশায় লিখে যায়, যশের পরিবর্তে পায় অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—তবু মদ ধরলে যেমন ছাড়া কঠিন হয়, তেমনই কঠিন হয়ে পড়ে লেখার বাতিক মাথায় একবার ঢুকলে তাকে তাড়ানো।

এ সবই আমি জানি। বললাম যে, এ ধরনের লোক এর আগেও আমি দেখেছি। সুতরাং এঁকেও যত্ন করে বসালাম। বাড়ীতে থাকি আমি একা, দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই—নতুবা একটু চা খাওয়ালে দেখাত ভাল। কুণ্ডু মশায় তাঁর দপ্তর খুলে তিনখানা মোটা খাতা বার করে পড়ে যেতে লাগলেন অবিরাম একটানা। এসব দলের লোকেরা তাই করে থাকে। আমি কতবার কত জায়গায় দেখেছি।

মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলছিলেন—কেমন লাগছে শ্যামবাবু?

—চমৎকার!

—হেঁ হেঁ—আপনারা রাইটার লোক, আপনাদের ভাল লাগলেই—। তার পর শুনুন এটা, 'সুভদ্রা-হরণ'—

—পড়ে যান।

একটানা চলেছে আবৃত্তির স্রোত—রাত বারটা বেজে গেল।

কুণ্ডু মশায় নাকের চশমা নামিয়ে আমার মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে বললেন—কেমন?

অর্থাৎ এটা আপনার ভাল লাগতেই হবে, উপায় নেই।

পুনরায় বললাম—চমৎকার!

এসব স্থলে এই জবাবই দিতে হয়, দেওয়া নিয়ম—অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

—আচ্ছা এটা শুনুন—'বাণ রাজার প্রতি উষা'।

পুরাণ ভাল পড়া নেই, বললাম—বাণ রাজা কে ?

আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে কুণ্ডু মশায় বললেন—বাণ রাজার কথা জানেন না ? বাণ রাজার মেয়ে উষা, দৈত্যরাজ বাণ—

বাল্যকালে দৃষ্ট 'উষা-হরণ' নামে এক যাত্রার অভিনয় অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই যুদ্ধ হল, অনিরুদ্ধ-টনিরুদ্ধ—উষা-হরণ—

আমার পৌরাণিক জ্ঞানের অবস্থা বোধ হয় কুণ্ডু মশায়ের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখার সৃষ্টি করল। তিনি আবার পড়ে যেতে লাগলেন। সাড়ে বারটা—পৌনে একটা। তিন চারটি কবিতা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলে কুণ্ডু মশাই এবার ওঠবার জোগাড় করবেন বলে মনে হল। আমার দিকে চেয়ে বললেন—দোকানের কাজ করি সারাদিন, ফুরসত পাই নে। আপনারা কলকাতায় থাকেন, রাইটার লোক—আপনাদের শোনালে মনটা তৃপ্ত হয়। আর কাকে শোনাব বলুন—সব মুখ্যুর দল—

—আপনি বুঝি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন ?

—হ্যাঁ, খাতাপত্তর লিখি। রাত দশটার সময় ছুটি পেয়ে আহারাদি সেরে তবে আপনার কাছে আসছি। একটু শুনিয়ে মনটা ভাল হয়।

—কতদিন থেকে লিখছেন ?

—বাল্যকাল থেকে। পাঠশালায় যখন পড়ি, হাতের লেখার খাতায় কবিতা লিখতাম। গুরু মশায়ের কত বেত খেতে হয়েছে সেজন্যে, মশায়। এখনও তাই। কেউ বোঝে না। দোকানে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা সবাই আমাকে খুব মানে, ভয় করে চলে—ভাবে, কবিতা লেখে এ মস্ত পণ্ডিত। যা লিখি, তাই ভাল বলে। আমার তাতে তৃপ্তি নেই—যত গণ্ডমুখ্যুর দল, ভাল বললেই বা কি, আর মন্দ বললেই বা কি !

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতরতানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥

আমার হয়েছে ভাগ্যে প্রত্যেক দিন মশাই ওদের সঙ্গে কারবার—অরসিক নিয়ে রসের কারবার। আমার ভাল লাগে মশাই, বলুন দিকি আপনি ?

—আপনি রবি ঠাকুরের নাম শুনেছেন ?

—হ্যাঁ শুনিছি মশাই। রবি ঠাকুর মস্ত বড় কবি। কোথায় যেন বাড়ী, যশোর না বীরভূম—

—কোনও কবিতা পড়েছেন তাঁর ?

—আজ্ঞে না।

কুণ্ডু মশায় বিদায় নিয়ে উঠলেন রাত একটার সময়।

এর পর আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল—কলকাতায় কর্মকোলাহলের মধ্যে কুণ্ডু মশায়ের কথা ভুলেই গেলাম একরকম। বড়দিনের ছুটিতে দুদিনের জন্যে বাড়ী গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি যে দোকানে কাজ করেন, সে দোকানের মালিক ও অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ধনী, জাতিতে তাঁতি—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, তবে লেখাপড়া কিছু তেমন জানেন না। লোকটি সজ্জন, রায় সাহেব খেতাব পেয়েছেন।

রায় সাহেবের বাড়ী কি-একটা কাজ উপলক্ষে আমিও নিমন্ত্রিত। সেখানেই কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-বিড়ি বিতরণে তাঁকে ব্যস্ত দেখা গেল। আমি একবার বললাম—কি কুণ্ডু মশায়, ভাল তো?

আমার দিকে চেয়ে তিনি একবার হাসলেন মাত্র, ব্যস্ত বলে আমার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ তাঁর তখন হল না।

রায় সাহেব হেঁকে বললেন—কুণ্ডু মশায়, চা দেওয়া হয়েছে কি না সকলকে দেখুন একবার বাইরে গিয়ে।

আহারাদির পরে দেখি সদর দরজায় কুণ্ডু মশায় দাঁড়িয়ে। বললেন—কাল বাড়ী থাকবেন নাকি?

—হ্যাঁ থাকব।

—কাল যাব একবার আপনার কাছে।

—নিশ্চয়ই আসবেন। লেখাটেখা আছে নাকি কিছু?

—অনেক লিখে ফেলেছি তার পর। শোনাব।

কিন্তু বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তার পরদিন আমাকে চলে যেতে হল অন্যত্র। কুণ্ডু মশায়ের কবিতা শোনবার সুযোগ সেবার আমার হয় নি।

এক বৎসর পরে আবার দেশে গিয়েছি। বর্ষাকাল, পথে-ঘাটে এক হাঁটু জলকাদা। বল্লভপুর ছাড়িয়ে নদীর ধারে বাবলাতলায় দেখি কে বসে মাছ ধরছে। আমি রাস্তা থেকেই পাড়াগাঁয়ের ধরনে জিজ্ঞেস করলাম···কি মাছ হল?

লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে চাইতেই দেখি কুণ্ডু মশায়।

—কুণ্ডু মশায়, মাছ, ধরতে এসেছেন নাকি? ভাল সব?

কুণ্ডু মশায় আমায় দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বললেন—প্রাতঃপ্রণাম। এই আসছেন বুঝি?

—কি মাছ পেলেন?

—আজ্ঞে, মাছ ধরছি নে তো। এই এমনি একটু বসে—মানে—একটু আধটু লিখছি—কৌতূহল হওয়াতে রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি কুণ্ডু মশায় ভিজে ঘাসের ওপর কাঁচা

ডালপালা ভেঙে পেতে বসেছিলেন—পাশেই একখানা মোটা পুরনো রোকড় কি খতিয়ানের খাতা। একটা শরের কলম ও পাঠশালার ছেলেদের মত দড়ি-বাঁধা দোয়াত, যাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। একখানা মসীলিপ্ত ব্লটিং কাগজ মাটির ঢেলা-চাপা এক পাশে।

—বাঃ এ যে কবিকুঞ্জ বানিয়ে তুলেছেন দেখছি।

—আজ আর দোকানে যেতে ভাল লাগল না। অনেকদিন বর্ষার পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখা গিয়েছিল—এখন আবার মেঘ করেছে। বলি, যাই নদীর ধারে বসে··· লেখার নেশা মাথায় একবার চাপলে—

—একটু শোনান কুণ্ডু মশায়। না শুনে আর যাচ্ছি নে।

কুণ্ডু মশায়ের কবিতার খাতা একখানা প্রাচীন খতিয়ান। খানিকটা পড়ে শোনালেন, কয়েক লাইন মনে আছে—

যদুকুলবধূ চতুরঙ্গিণী সহায়ে
কৃষ্ণতুল্য সুভদ্রারে সারথি করিয়া
আরোহিয়া কপিধ্বজে অর্জ্জুনসমান
গাণ্ডীব কোদণ্ড ধরি উত্তরিব রণে।
শিখণ্ড আমার জ্যেষ্ঠ, তারে নারী ভাবি।
ধরে না ধনুক ভীষ্ম ;···(মনে নেই)
ভূমণ্ডল অকৌরব করিবে দ্রৌপদী।

মজানদীর পাড়ে বিকেলে বসে বেশ ভাল লাগল। বললাম—চমৎকার! আপনার শব্দ সাজাবার ক্ষমতা, ধ্বনির জ্ঞান, সব চমৎকার। দ্রৌপদী যুদ্ধযাত্রা করতে চাইছেন বুঝি?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু কোন জায়গায় বলুন তো?

মাথা চুলকে বললাম—তা তা—কই ঠিক তো বুঝতে পারছি নে—

কুণ্ডু মশায় আমার উত্তরের দিকে কান না দিয়ে বললেন—শুনে যান আর একটু—

শত তীক্ষ্ণ শর
মম করোন্মুক্ত যবে উঠিবে উড়িবে
গৃধ্রপংক্তি সম ব্যোমে শোণিতপিপাসু,
দেখিব কি করি করে ব্রতরক্ষা তাঁর
দেবব্রত। রণচণ্ডী শিখণ্ডী-ভগিনী
আখণ্ডলে রক্ষিলেও ছাড়িবে না তাঁরে।

হাসি-হাসি মুখে বললেন—কেমন?

—এ আর বলতে! আমার খুব সৌভাগ্য যে, আজ কবির মুখে—কি ঝঙ্কার!

কুণ্ডু মশায় বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—অমন কথা বলবেন না, আপনারা রাইটার লোক—

—ভাষার ওপর সমান অধিকার সব লেখকের থাকে না। আপনার তা আছে কুণ্ডু

মশায়। আর আপনি একজন সত্যিকার কবি। নয় তো পালিয়ে এসে এই নদীর ধারে বসে আপন মনে—

কুণ্ডু মশায় পাশের একটি থেলো হুঁকোয় তামাক সাজছিলেন এতক্ষণ। আমায় বললেন—খান ?

—না। আপনি খান।

হুঁকোয় বেশ আরামে টান দিয়ে বৃদ্ধ এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চাইলেন, যেন জীবনের এক বড় আনন্দের সম্মুখীন হয়েছেন—অর্থাৎ থেলো হুঁকোটিতে টান দেবার অবকাশ পেয়েছেন।

বললেন—আমার মাথায় যখন লেখার নেশা চেপে যায়, তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। পালিয়ে আসতেই হবে—একটু ফাঁকা নির্জ্জন জায়গা খুঁজতেই হবে।

—আপনার বাসা তো নির্জ্জন ? আপনি তো একাই থাকেন শুনেছি ?

—মোটেই না। কাপড়ের গদির সাতজন কর্ম্মচারী সব এক ঘরে থাকি। সব কজন সমান গোলমাল করে। সেখানে বসে লেখা ··কাল আসবেন দয়া করে ? দেখবেন ?

পরদিনই কুণ্ডু মশায়ের বাসায় গেলাম। কুণ্ডু মশায় এক বর্ণ অতিরঞ্জিত বলেন নি। বসাকদের কাপড়ের গদির পেছনে অতি অন্ধকার, প্রায় জানালাবিহীন নাতিক্ষুদ্র একটা ঘরে চারখানি সরু সরু তক্তপোশ পাতা। প্রত্যেক তক্তপোশে কাপড়ের গাঁটবাঁধা চট আগে পেতে তার ওপর অতি মলিন শয্যা বিস্তৃত। বালিসগুলো থেকে চিমটি কাটলে তেল আর ময়লা ওঠে। ঘরে আড়া-আড়ি অনেকগুলো দড়ি টাঙানো—তাতে ময়লা ও আধময়লা লুঙ্গি, ন-হাতি কাপড়, সেলাই করা পুরনো কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া। একটা তক্তপোশের তলায় একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর এক জোড়া নতুন বাদামী রঙের ফিতে-আঁটা জুতো সযত্নে তোলা। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা বিবর্ণ পুরনো খবরের কাগজ। তার ওপরে কাঠের ছোট আলনায় দু-একটা ছিটের কক-আঁটা কামিজ, কোনটায় কুষ্টিয়ার ছিটের একটা আলোয়ান। সমস্ত ঘরটা স্থূলত্ব, নোংরামি, কুশ্রীতা, রুচিহীনতার একখানি সুস্পষ্ট ছবি।

একপাশের তক্তপোশে জনচারেক লোক বসে তাস খেলছে, কারও গা খোলা, কারও গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। আমার প্রশ্নের উত্তরে একজন বললে, কুণ্ডু মশায় গদি থেকে ফেরেন নি। একজন কুণ্ডু মশায়ের খাটখানা আমায় দেখিয়ে দিলে। তাঁর বালিস অতোধিক ময়লা, উপরন্তু একটা ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বসবার পরে তাস-খেলোয়াড়দের হর্ষধ্বনি ও চীৎকার আমার নিকট অসহ্য মনে হওয়ায় একটু বাইরে যাব ভাবছি, এমন সময় কুণ্ডু মশায় ঘরে ঢুকলেন।

ওদিকে খেলোয়াড়দের একজন বলে উঠল—ও দাদু, তোমার ইলিশ মাছ সব কানু খেয়ে—এই দেখ।···বক্তা মুখে পুরে দেবার অভিনয় করে ব্যাপারটা বোঝালে।

আর একজন বললে—এত দেরি হল কেন ? বাবুর হাতে নাকানিচোবানি খেয়েছ কেমন, বল ?

আমার দিকে চেয়ে কুণ্ডু মশায় বললেন—আপনি যে! আপনি যে এখানে আসবেন, তা ভাবি নি। বসুন, দুটো খেয়ে আসি। এখন ছুটি পেলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে—

বেলা আড়াইটে উত্তীর্ণ প্রায়। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধকে আমি একটুও দেরি করতে দিলাম না। বললাম—যান শীগগির যান, আহার করে আসুন।

কুণ্ডু মশায় চলে গেলে আমি তাস-খেলুড়েদের উদ্দেশ করে বললাম—এখানে খাওয়া হয় কোথায়?

একজন বললে—এই ঘরের পর উঠোন, তার ওদিকে রান্নাঘর। গদির ঠাকুর আছে, সেই রাঁধে।

—কি রকম খাওয়ায়?

—সে কথা আর ওঠাবেন না দাদা। উরসুনি ডালের জল, এই এতটুকু খয়রা মাছ কি তিংপুঁটির ঝোল, একটা লাল ডাঁটা দিয়ে কুমড়ো দিয়ে ঘ্যাঁট—ছিঃ—মানুষের যুগ্যি নয়।

একজন বলে উঠল—পরের পয়সায় খেতে আর কত দেবে বল? ওই যা পাচ্ছ, তাই ঢের।

কুণ্ডু মশায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে এলেন, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল। তার পর কাপড়ের গাঁট-বাঁধা চটের উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—এখানে এসে বসুন।

—চলুন না দীঘির ধারে গিয়ে একটু বসা যাক।

—আজ আর ছুটি নেই, কলকাতা থেকে মহাজন আসবে এই ট্রেনে, হিসেব ঠিক করে দিতে বলেছেন বাবু—ও গোষ্ঠ, পাইকেরী মালের ফিরিস্তিগুলো করে ফেল গিয়ে—বসে তাস পিটলে চলবে না।

এমন সময়ে হঠাৎ হল্লা ও হাসি মন্ত্রমুগ্ধবৎ থেমে গেল।

রায় সাহেব ঘনশ্যাম বসাকের স্থূল, চিক্কণ, সুখাদ্য-পরিপুষ্ট দেহ দোরের কাছে দেখা যেতেই তাস-খেলোয়াড় কজন এবং কুণ্ডু মশায় তড়াক করে চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রায় সাহেব বললেন—এত গোলমাল কিসের কুণ্ডু মশায়?

ঘরের মধ্যে সকলের অবস্থা তখন হঠাৎ হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকলে কোলাহলরত স্কুলের ছাত্রদের মত। সবই পাষাণ-মূর্ত্তির মত একদম জমে গেল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে রায় সাহেব বললেন—এই যে, শ্যামবাবু যে—এখানে আপনি?

—একটু কুণ্ডু মশায়ের কাছে দরকার ছিল।

—কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আপনার বনবে ভাল। কুণ্ডু মশায় শুনেছি কবিতা লেখেন। মানে, লোকটা ছিল ভালই, কিন্তু ওর মাথায় কি পোকা আছে—থাকে থাকে, ফট করে একদিন দেখি গদিতে নেই। কোথায় গেল? বসে নাকি কোথায় কবিতা লিখছে। আমার গদির কাজ চলে কি করে? কবিতা-লিখে তো পেট ভরবে না দাদা। কি বলেন?

তা বটে।

রায় সাহেব কুণ্ডু মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন—যাও সব, শদিতে যাও। এখানে হল্লা করবার জন্তে তোমাদের রাখা হয় নি—কবিতা লেখবার জন্তেও নয়। যাও—কুণ্ডু মশায়, মহাজনের দেনাপাওনার হিসেবটা বেলা পাঁচটার মধ্যে ঠিক করে ফেল গিয়ে। যাও সব।

পরে ঘরের চারিদিকে অপ্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—নিজেরা থাকে—অথচ ঘরদোর বিছানাপত্তর কি নোংরা করেই রাখে—রামোঃ। ওসতীশ, দশগজা ফুলন শাড়ীর একজোড়া কাল হিসেবের খাতায় ওঠে নি কেন?

সতীশ-নামধেয় লোকটি এতক্ষণ তাসের আড্ডায় বেশি চেঁচামেচি করছিল। সে যেন অতিরিক্ত বিস্ময়ে হঠাৎ কাঠ হয়ে বললে—সে কি বাবু! দশগজা ফুলন শাড়ী কাল কে বিক্রি করলে? এই তো কুণ্ডু মশায়, জানেন?

কুণ্ডু মশায় নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বললেন—আমি কি জানি বাপু। আমি খতেন রোকড় নিয়ে আছি, তোমাদের খুচরো বিক্রির তবিলে কি হয় না হয়—

রায় সাহেব বলিলেন—সব চোরের আড্ডা হয়েছে। ভাত-কাপড় দিয়ে চোর পোষা। আচ্ছা, আজ ধরা পড়লে তাকে আমি জবাব দেব, নয় এক মাসের মাইনে কাটব।

রায় সাহেব চলে গেলেন।

এই হল কুণ্ডু মশায়ের প্রতিদিনের জীবন। এই অত্যন্ত স্থূল আবহাওয়ার মধ্যে একটি কবিপ্রাণ কিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে, তা আমার অভিজ্ঞতায় লেখা নেই। কুণ্ডু মশায়ের এই বয়সেও যে সজীবতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট, ছাইপাঁশ আহারেও তাঁর যে তৃপ্তি, এত হট্টগোল ও অপমানের মধ্যেও তাঁর যে আনন্দ—এ সবের জন্ত সমঝদার লোকমাত্রেই তাঁকে হিংসে না করে পারবে না।

তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ আর অনেকদিন হয় নি।

এর প্রায় পাঁচ বছর পরের কথা। অন্ত জায়গায় কাজ করি বলে দেশে আসা ঘটে নি অনেকদিন। দেশের বাড়ীঘর ভেঙে গিয়েছিল, মিস্ত্রি লাগিয়ে মেরামত করছি।

—এই যে শ্যামবাবু, প্রাতঃপ্রণাম!

চেয়ে দেখি, কুণ্ডু মশায়। আরও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, মাথায় আর এক গাছাও কাঁচা চুল নেই। সেই পুরনো ধরনেই বেনিয়ান গায়ে।

—কি ব্যাপার কুণ্ডু মশায়? ভাল আছেন বেশ? খবর কি?

—বাবু পাঠিয়ে দিলেন। আপনি বাড়ী করবেন,—চুন সিমেণ্ট নেবেন আমাদের নতুন আড়ত থেকে। দর সস্তা।

—ও। কে, ঘনশ্যামবাবুরা চুনের আড়ত খুলেছেন বুঝি?

—চুন, সিমেণ্ট, মগরায় বালি—

—বেশ বেশ। বসুন।

—না, আর বসব না। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ী থেকে।

—কবিতা লেখা-টেখা হয় কি আর?

—আপনি আছেন তো এখন; আসব একদিন।

বলে সামান্য কয়েক পা গিয়েই ফিরে এসে বললেন—ভাল কথা, পকেটেই আছে, আজ আপনার এখানে আসতে আসতে বটতলায় বসে লিখলাম কটা লাইন—

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্য্যে ভাসায়ে আঁখি
সাধ হয় অনিমেষে শুধু যেন চেয়ে থাকি।
নীরবে নিঝুমে সেথা কি যেন মুখের পরে
স্বপ্নরেণু কিংবা মায়া নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিতে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা;
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা?

কুণ্ডু মশায়কে কোলে তুলে নিয়ে নাচবার ইচ্ছে হল, ব্রাহ্মণ না হলে পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম। বললাম—এই কটা লাইন এইমাত্র লিখলেন পথে আসতে আসতে?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—বটতলার ছায়ায় বসে, খানিকটা আগে।

—আপনি ঘনশ্যামবাবুর দোকানে কাজ করেন বটে কিন্তু আপনি সে জায়গায় উপযুক্ত নন। কবিতায় আর্টের কোন দরকার নেই। আপনার মনের আনন্দের অনুভূতিকে ধ্বনি ও ঝঙ্কারের মধ্যে প্রকাশ করছেন এবং সফল হয়েছেন, সেইটেই বড় কথা। আমি আপনার মনের সেই সময়ের অনুভূতিকে ওই কটা কথার মধ্যে দিয়ে নিজের মনে ধরতে পারছি—ওই হল কবিতা।

চুন কিনতে গিয়ে রায়সাহেবের দোকানে বসলাম খানিকটা। মস্ত বড় গদি, লোকজন খাটছে, নানারূপ ব্যবসাদারী শব্দ ও বোল উত্থিত হচ্ছে—'ছএর দাগের নিয়ে এস', 'বাইশ শ বাইশ রেলি দশ জোড়া', 'মিহি জরিপাড় চন্দননগর', 'খতেনের আঠান্নর পাতা' ইত্যাদি। পাইকারী ক্রেতাদের বড় ভিড় লেগেছে, ঝম্ ঝম্ টাকার শব্দ উঠছে—ওদিকে গদির এক পাশে আনকোরা টাটকা দশটাকার নোট তাড়াবন্দী হচ্ছে।

ঘনশ্যামবাবুকে একপাশে বসে থাকতে দেখে কাছে গেলাম। গত পাঁচ বৎসরে রায় সাহেবের বয়স যেন পনের বছর বেড়েছে। আমায় বললেন—আসুন, বসুন শ্যামবাবু, অনেকদিন দেখি নি।

—ভাল আছেন?

—ভাল কোথায়? আঠ বছরাবধি ভুগছি নানা অসুখে। আর এইবার বোধ হয় চললাম—

—না না, সে কি কথা! আপনার বয়েসটা কি!

—আপনি জানেন না, দুটি হাজার টাকা খরচ করেছি এক বছরের মধ্যে। কিন্তু

সারবার নামটি নেই, বেড়েই চলেছে। দোকানে আসি যাই—মনেও বল পাই নে, শরীরেও না। ডাক্তারের কথায় মাগুরমাছের ঝোল খাই, কাঁচকলা আর পটল দিয়ে—একবেলা দুখানি সুজির রুটি।

—কোথাও চেঞ্জে যান না কেন?

—ব্যবসা ফেলে যেতে পারি নে। আবার নতুন চুন সিমেন্টের আড়ত খোলা হয়েছে, এসব কার ওপর দিয়ে—

রায়সাহেবের কথার সুরে এবং মুখের চেহারায় একটা জিনিস বেশ সুস্পষ্ট হল আমার কাছে, তাঁর মনে আনন্দের অভাব এবং একটা ভয়ের ভাব। কথাবার্তার মধ্যে কণ্ঠের যে মিহি-সুর ধ্বনিত হচ্ছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুভয়, জড়িয়ে রয়েছে নৈরাশ্য ও মূঢ় অন্ধতা। এত ঐশ্বর্য্য থেকেও ভোগের তৃপ্তি নেই।

যতক্ষণ আমি সেখানে বসে ছিলাম, ঘনশ্যামবাবুর মুখে আমি আনন্দের রেখা খোঁজবার বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। আনন্দের পরিবর্ত্তে বরং ভয়টা এত বেশি দেখেছি যে লোকটার কাপুরুষতার ওপরে আমার ঘৃণা জন্মেছে। এত টাকা থেকেও লোকটা সত্যিকার অসুখী। বাইবেলের সে বাণী মনে পড়ল—Men cannot live by bread alone—জীবনের বড়-পুঁজি নেই যেখানে, সেখানে শুধু টাকার পুঁজি মানুষকে অমৃতের পুত্রত্ব দান করে সাধ্য কি তার?

তারও চার বৎসর পরে এবারের কথা।

বাড়ীতে এসেছি দশ-বার দিন কি তার বেশি। কাজের গোলমালে অন্য কোথাও যেতে পারি নি—কেবলমাত্র একদিন বল্লভপুর বাজারে অতি অল্প সময়ের জন্যে রায়সাহেবের গদিতে গিয়েছিলাম। কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই পর্য্যন্ত, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয় নি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে বসে আছি, একজন লোক এসে বললে—শ্যামবাবু এ বাড়ীতে থাকেন? লোকটার খালি পা, হাতে একটা লাঠি আর হারিকেন লণ্ঠন।

—কোথা থেকে আসছ?

—আজ্ঞে বাবু, প্রণাম হই। বল্লভপুরের আড়তের কুণ্ডু মশায় আপনাকে ডেকেছেন। তিনি বাঁচেন না, আপনাকে এখুনি যেতে হবে।

—কুণ্ডু মশায় বাঁচেন না! কেন, কি হয়েছে তাঁর?

—বাবু, তিনি আজ সাত দিন শয্যাগত। জ্বর, কাসি—

—তা আমি তো ডাক্তার নই? আমি কেন যাব?

—তিনি সন্ধ্যে থেকে কেবল আপনার কথা বলছেন। আমায় বলে দিলেন, যে-করে হোক নিয়েই আসতে হবে তাঁকে।

আমি একটু বিরক্ত না হয়ে পারলাম না। অনেক দিনের অদর্শনে কুণ্ডু মশায়ের ওপর

পূর্ব্বের আন্তরিকতা অনেকখানি চলে গিয়েছে। তবুও গেলাম। মুমূর্ষু বৃদ্ধের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সেই আড়তের ঘরের সেই বিছানাতে কুণ্ডু মশায় শুয়ে। মাথার শিয়রে কেবল একটা ছোকরা বসে আছে—ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। একটা লণ্ঠন আধ-নেবানো ভাবে জ্বলছে ঘরের মেজেতে। একটা বাটিতে আধবাটি জল-বার্লি। গোটাকতক কাগজি নেবুর খোসা লণ্ঠনের পাশে।

কুণ্ডু মশায় বোধ হয় ঘুমুচ্ছিলেন কিংবা অর্দ্ধচেতনভাবে শুয়ে ছিলেন। ছেলেটি ডাকলে —ও দাদু, দাদু, বাবু এসেছেন—

কুণ্ডু মশায় চমকে বলে উঠলেন—অ্যাঁ—

—ঐ সেই বাবু এসেছেন—

ততক্ষণ আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি। কুণ্ডু মশায় হাতের ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললেন। আমি বিছানার একপাশেই বসে বললাম—কি হয়েছে কুণ্ডু মশায়? জ্বর নাকি?

প্রায় এক মিনিট কুণ্ডু মশায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। তার পর ক্ষীণ স্বরে বললেন—আর কি, এবার চললাম শ্যামবাবু—

আমি ভরসা দেওয়ার সুরে বললাম—সে কি কথা। এখনও কত কবিতা শোনাবেন আমাদের—যেতে দেব কেন?

কুণ্ডুমশায়ের মুখে অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোয় যেন ক্ষীণ হাসির রেখা দেখতে পেলাম। বললেন —ডাক এসেছে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ—সেইজন্যে—

—বলুন, বলুন।

—এই ছেলেটি দেখছেন—বড় সৎ, বাবুদের গদিতে কাজে ঢুকেছে এ বছর, ছেলেমানুষ —ওই দেখে।

আমি ছেলেটিকে বললাম—তোমার নাম কি?

—সুশীল।

—এই ঘরের আর সব লোক কোথায়?

—সব পালিয়েছে। দুজন কাল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে, দুজন দোকানঘরে শুয়ে আছে বারান্দায়।

কুণ্ডু মশায় যেন মাছি তাড়াচ্ছেন মুখের কাছ থেকে—দুর্ব্বল হাতে দু একবার এমনি ভঙ্গি করে চুপ করে রইলেন। প্রায় দশ মিনিট ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই। তার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার খাতাগুলো—

বুঝতে না পেরে বললাম—খাতা?

—কবিতার খাতাগুলো আপনার হাতে দিয়ে যাব। বড় আদরের! ছেলেমেয়ে নেই! ওই ছেলেমেয়ে। খাতাগুলো—থেমে থেমে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কুণ্ডু মশায় কথাগুলো শেষ করলেন।

—ব্যস্ত হবেন না। স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন। আচ্ছা সে হবে—সেগুলো কোথায়?

কুণ্ডু মশায় শিবনেত্র হয়ে শিয়রে উপবিষ্ট ছোকরার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ছেলেটি তখনই নিজে থেকে বললে—উনি আমায় সন্ধ্যেবেলা বলেছিলেন গুছিয়ে রাখতে—ওঁর তোরঙ্গ থেকে বের করে রেখেছি।

কুণ্ডু মশায় বললেন—এঁর হাতে দাও।

আমি হাতে নিয়ে বললাম—পেয়েছি। এগুলো কি করব বলুন আমায়।

আবার তিন চার মিনিট কেটে গেল—রোগী নিরুত্তর। তারপর আমার হাতে দুর্ব্বল হাত তুলে দিয়ে বললেন—আপনার কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন। ওদের যত্ন আর কোথাও হবে না। ভার নিলেন?

—নিলাম, ভাববেন না।

কুণ্ডু মশায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন—আর কোন ভাবনা নেই। মরণে ভয় করি নে, বয়েস হয়েছে। এই খাতাগুলো—। শেষের দিকের কথাগুলো যেন কুণ্ডু মশায় আপন মনেই বললেন।

এই তাঁর শেষ কথা। আমি সারারাত বসে ছিলাম তাঁর শয্যাপার্শ্বে। রাত্রিশেষে কুণ্ডু মশায় মারা গেলেন। শবানুগমনের সময় আমি সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করলাম। আমারই অনুরোধে তাঁর প্রিয় মজা খালের ধারে তাঁর দাহকার্য্য সমাধা হল। চিতার ওপর আমি আমার নিজের হাতে বন্য ছোটগোয়ালে লতার ফুল নিকটবর্ত্তী ঝোপ থেকে তুলে এনে ছড়িয়ে দিলাম।

রায় সাহেবের সঙ্গে দিন চারেক পরে দেখা। আমায় বললেন—আপনি সেদিন শুনলাম খুব করেছেন। লোকটা নিজের দোষেই মারা গেল।

সঞ্চয়

অতুল স্ত্রীকে ডেকে বললে—সে টাকা কোথায় গেল? বাক্সের মধ্যে যে টাকা ছিল?

স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, স্বামীকে বেশ ভয় করে। সম্প্রতি টাইফয়েড থেকে উঠে অনেক কথাই মনে করে রাখতে পারে না।

ভয় পেয়ে বললে—কেন, বাক্সের মধ্যে তোয়ালে-বাঁধা ছিল—নেই?

—দেখছি নে তো। তুমিও দেখ না খুঁজে।

যা গিয়েছে তা আর পাওয়া যায় না। সে টাকাও পাওয়া গেল না। বাক্সের মধ্যে তো নেইই—কোথাও তা নেই। বিমলা সারা দুপুর ধরে শত জায়গায় খুঁজেও তার কোন কিনারা করতে পারলে না। সন্ধ্যার সময় ম্লান মুখে এসে স্বামীকে বললে—সে তো পেলাম না?

—পাবে না আমি জানি। আমার জিনিসে তোমাদের কোন মায়া নেই। যেদিন নিরুপমা (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) গিয়েছে, সেদিনই সব গিয়েছে। তোমার বাক্সে অতগুলো টাকা রইল ; কাপড় আছে, সায়া-সেমিজ, পাউডারের কৌটো ঠিকই রইল—তোয়ালে-বাঁধা টাকাটাই গেল চুরি!

সন্ত টাইফয়েড থেকে উঠেছে বিমলা।

তার অধিকাংশ কথাই মনে থাকে না। তোরঙ্গের মধ্যে তার জামাকাপড় সাবান এসেন্স ছিল সবই সত্যি বটে, কিন্তু সে ভেবে দেখলে গত তিন মাসের মধ্যে সে রোগশয্যায় পড়ে ছিল মাস দুই—মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছে তাও সে জানে। স্বামীই সর্ব্বদা শিয়রে বসে পাখার বাতাস করে, মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, কত রকমে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে—একথা তার ভাসা-ভাসা মনে আছে। অসুখ সেরে উঠে আজ দিন কুড়ি সে বাপের বাড়ী এসেছে—সেই তোরঙ্গটাও এখানে এসেছে সঙ্গে।

অসুখের আগে একদিন অতুল খাজনা আদায় করে অনেকগুলো টাকা আনে। বিমলা বায়না ধরলে—ওগো, কিছু টাকা আমায় দাও—দিতেই হবে—ছাড়ব না কিছুতেই।

অতুল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অন্যায় আবদারে একটু বিরক্ত না হয়ে পারলে না। সংসার-খরচের টাকা, জমাবার মত বেশি টাকা যদি থাকত তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তা যখন নেই অত বড় মেয়ের বোঝা উচিত। কিন্তু স্ত্রী বায়না ধরলে ছেলেমানুষের মত—এ টাকাগুলো আমি আমার বাক্সে তুলে রাখব—দাও আমাকে, ওগো?

অতুল পাঁচটি টাকা অন্য খরচের জন্য রেখে বাকি টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। অতুলেরই একটা আধ-ময়লা রুমালে বিমলা টাকাগুলো বেঁধে তাকে ছোলার কলসীর মধ্যে রেখে দিল।

রাত্রে অতুল বললে—টাকা কোথায় রেখেছ?

—তাকে, ছোলার কলসীর মধ্যে।

—থাক, ভাল জায়গা। কেউ টের পাবে না।

এর কিছুদিন পরে বিমলা পড়ল শক্ত টাইফয়েডে। দুদিন পাঁচদিন করে যখন আঠার দিন কেটে গেল—তখন বাড়ীর ঝি একদিন বিমলার ভাগ্নীকে বললে—দিদিমণি, ছোলাগুলো রোদ্দুরে দেব? বর্ষাকাল, নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

বিমলার এই ভাগ্নী তার মামার সংসারেই থাকত। অবিবাহিতা, তের-চৌদ্দ বছর বয়েস। সে ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না টাকার খবর। তার সম্মতি পেয়ে ঝি ছোলার কলসী ঢাক থেকে পেড়ে ছোলা ঢালতে গিয়ে রুমালে-বাঁধা কি একটা দেখতে পেলে।

প্রথমে সে বুঝতে পারে নি জিনিসটা কি। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে যখন বুঝলে এতে পয়সাকড়ি বাঁধা, ততক্ষণ বিমলার ভাগ্নী জয়ন্তী সেখানে চুলের দড়ি রোদে দিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তী বললে—কি গো ওটা?

—তা কি জানি দিদিমণি, এই তো বেরুল এর ভেতর থেকে—কি জানি।

—দেখি দেখি, দাও তো ?

বাড়ীতে কেউ নেই, মামা কোথায় বেরিয়েছে, সে শয্যাগত মামীর কাছে রুমালে-বাঁধা টাকা এনে বললে—মামীমা, এ টাকা তুমি রেখেছিলে ছোলার কলসীতে ?

বিমলার তখন ভীষণ জ্বর, গা তেতে তপ্ত খোলার মত। সে তাড়াতাড়ি জ্বর-অবস্থায় উঠে হাত বাড়িয়ে বললে—দে, আমার টাকা—

অতুল সেই সময় ঘরে ঢুকে সব শুনে বলল—তুমি শোও, শোও—টাকার জন্যে কি ? শুয়ে পড়।

—আমার এই টাকাগুলো রেখে দেবে ?

—হ্যাঁ, আমি রেখে দিচ্ছি, রেখে দিচ্ছি।

—দাঁড়াও ক টাকা গুণে রেখে দিই। এক, দুই, তিন—এই আঠার টাকা সাত আনা। কোথায় রেখে দেবে ?

—আমি ঠিক জায়গাতে রেখে দেব। তুমি নিজের বুদ্ধিতে টাকা রাখতে গিয়ে হারিয়েছিলে তো টাকাটা ? বিন্দি না দেখলে ঝি মাগী চক্ষুদান করেছিল আর কি ! আমার কাঠের বাক্সটাতে রেখে দেব, কেমন ?

—রেখে দাও। তুমি যেন খরচ করে ফেলো না তা বলে ? ও আমার টাকা, আঠার টাকা সাত আনা—মনে করে রেখে দিলাম।

তার পর বিমলার অসুখ ভীষণ বেড়ে গেল। অতুলের পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট সংসার—মেটে ঘর, খড়ের চালা। সংসারে আছে মাত্র ভাগ্নী আর স্ত্রী। আর দ্বিতীয় পুরুষমানুষ নেই। সে পড়ে গেল মহা মুশকিলে। রোজ মহকুমা থেকে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ডাক্তার আনতে হয়। খরচ যা পড়ে, তাতে সামান্য খাজনাপত্রের আয়ে কোনমতেই কুলোয় না, কদিনেই বেশ কিছু ঋণগ্রস্ত হতে হল।

বিমলার জ্ঞান-চৈতন্য নেই। যখন একটু জ্ঞান হয়, তখন কেবল বলে—জল খাব, আমায় জল দাও—এক ঘটি জল দাও—

তার পরেই আর জ্ঞান থাকে না।

ডাক্তার বললে, চেষ্টার তো ত্রুটি করেছি নে অতুলবাবু, তবে এই সোমবারটা না কাটলে কিছু বলতে পারব না।

—ও বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু ?

—কি করে বলি বলুন, সবই ভগবানের হাত। কাল একটা ইনজেকশন দেব ভাবছি।

ইনজেকশনের কথা শুনে বিমলা ভয় পেয়ে গেল। ইনজেকশন করলে ভারি নাকি লাগে, গা ফুঁড়ে ওষুধ দেওয়া, সে নাকি বড় খারাপ কথা। অতুল নানারকমে তাকে বুঝিয়ে রাজী করালে।

রাত্রে আবার বিমলা বললে, হ্যাগা, কাল সকালে আমাকে নাকি ইনজেকশন দেবে ?

—কেন, তখন তো তুমি রাজী হলে ?

—একটা কথা বলব ? আমায় আর ওসব কষ্ট দিও না।

—কেন, কি হল আবার ?

—আমি এবার বাঁচব না। তোমার অদৃষ্টে বৌ নিয়ে সংসার করা নেই দেখছি।

—ওসব কথা বলতে নেই এখন। ছিঃ, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তোমার কোন বুদ্ধি নেই। যা বলছি তাই শোন।

—শুনেছি। তুমি বেশি কথা বলো না। ডাক্তারে বারণ করে গিয়েছে।

—হ্যাগা, তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

—সে আবার কি কথা! নিশ্চয়ই। তোমার কি হয়েছে ? এর চেয়েও শক্ত অসুখ হয় লোকের, তারা বেঁচেও ওঠে।

বলে, অতুল কে কোন্ দুঃসহ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছে তারই তালিকা, কতক স্মৃতি থেকে কতক কল্পনার ওপর নির্ভর করে আবৃত্তি করতে লাগল স্ত্রীর শিয়রে বসে। রায়দের বাড়ীর বড়-বৌ পাঁচ মাস অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, ননী চক্কত্তি এই ধরনের টাইফয়েডে ভুগে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তারা সেরে সামলে উঠে দিব্যি সংসারধর্ম্ম করছে।

বিমলা বললে, সে কতদিন আগে ?

—ওঃ, তখন নিরু বেঁচে আছে। তুমি তখন হয়তো জন্মাও নি।

—আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার কাছ ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, স্বর্গেও না।

—তোমার তো সেরে গিয়েছে। ভাবনা কিসের ? চুপটি করে শুয়ে থাক তো!

—সত্যি আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে ?

অতুল দেখলে বিমলার রোগজীর্ণ কপোল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখের ভাব এত বদলে গিয়েছে যে ওকে সেই বিমলা বলে চেনাই যায় না। ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে অতুল বললে, অমন কথা বলে না। নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে, সে আবার একটা কথা কি।

বিমলা নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেমানুষের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমবারের বিপদ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেটে গেল এবং বিমলা ক্রমে ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হয়ে পথ্য পেলে দু মাস অতি কঠিন রোগভোগের পরে। অসুখ সেরে উঠে বিমলার মস্তিষ্ক কেমন দুর্ব্বল হয়ে গেল, কোন কথাই সে মনে রাখতে পারে না। আট দশ দিন এভাবেই কাটল। সকালবেলা আহারাদির পরে হয়তো একটু চুপ করে শুয়ে থাকে, তার পর দুপুরের দিকে উঠে বিছানায় বসে জয়ন্তীকে ডাকাডাকি করে—ও বিন্দি, শুনে যা—ও বিন্দি—

—কি মামীমা ?

—কত বেলা হয়ে গেল, আমায় ভাত দিবি নে ?

—সে কি মামীমা। তুমি রোগা মানুষ, নটার সময় যে তোমাকে ভাত দিয়ে খাইয়ে গেলাম পাশে বসে।

—না, আমি খাই নি—দে, ভাত দে—

—তুমি ভুলে গেলে মামীমা, ভাত দিয়ে গেলাম যে। তুমি যে খেয়ে শুয়ে ছিলে—

—হাঁা, তোদের সব মিথ্যে কথা। আমায় খেতে দিবি নে তাই বল্। দে দুটো ভাত !··· বিমলা ছেলেমানুষের মত কাঁদতে শুরু করলে।

জয়ন্তী স্নেহের সুরে বললে—কাঁদতে নেই মামীমা ছিঃ, তোমার মনে থাকে না কিছু। ভাত তোমাকে খাইয়ে গিয়েছি—আচ্ছা মামাবাবু এলে জিজ্ঞেস করো—

—হাঁা, যেমন তুই, তেমনি তোর মামাবাবু—আমি এদিকে খিদের জ্বালায় মরছি—

জয়ন্তী নানারকমে ভুলিয়ে তার দুর্ব্বলমস্তিষ্ক মামীমাকে শান্ত করে ঘুম পাড়ালে।

•

শ্রাবণের শেষ। ভীষণ বর্ষা পড়ে গেল। দিন নেই রাত নেই, সব সময় বৃষ্টি। খানা-ডোবা জলে থৈ থৈ করছে, পটলের ক্ষেত সব জলে ডুবে গিয়েছে বলে হাটে-বাজারে পটল বেজায় আক্রা।

একদিন বিমলা স্বামীকে ডেকে চুপি চুপি অপরাধিনীর মত বললে—ওগো, একটা কথা বলব ?

—কি ?

—আমি একটা ভুল করে বড় লোকসান করে ফেলেছি,—বল, আমায় বকবে না ?

—আগে শুনি না ?

—বকবে না আগে বল—

—আচ্ছা, বকছি নে।

—দেখ, তুমি সেই একবার আমায় টাকা দিয়েছিলে মনে আছে। আমার অসুখের আগে ? সে আমি তাকের ওপর ছোলার কলসীটার মধ্যে রেখেছিলাম। আজ আস্তে আস্তে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ছোলার কলসীটা পেড়ে দেখলাম সে টাকা নেই। সে তো কেউ জানত না। আমার অসুখের সময় কে বের করে নিয়েছে। আমার মনে হয় ঝি মাগীটা—এখন কি ও কবুল যাবে ? কত টাকা ছিল তোমার মনে আছে ?

অতুলের মনে কি কুবুদ্ধি চাপল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে স্ত্রীর অসুখে। বেশি তো নয়, আঠার টাকা সাত আনা মাত্র। বিমলার মনে নেই যে ভীষণ অসুখের সময় টাকাটা সে তারই হাতে দিয়েছিল। বললে, তা থাক গে। গিয়েছে তো গিয়েছে—সামান্য টাকা—

—ঝিকে একবার বল না ?

—ও ঝগড়া বাধাবে তা হলে। কেউ তো ওকে দেখে নি টাকা নিতে ? কি আর হবে।

—কত টাকা তোমার মনে আছে? একটা ময়লা রুমালে বাঁধা ছিল মনে হচ্ছে যেন। আহা, কতগুলো টাকা—আমার অদেষ্টেই গেল! তুমি কিছু মনে ক'রো না—লক্ষ্মীটি। রাগ করবে না আমার ওপর? তোমার ক্ষেতি-লোকসান করতেই আমি আছি।

বিমলা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একবার অতুলের মনে হল সব কথা স্ত্রীকে মনে করিয়ে দেয়। বলে, ভেবো না, লক্ষ্মীটি—ঠাট্টা করছিলাম। টাকা যে সেই তুমি আমার হাতে—

কিন্তু তখনই ভাবলে, হবে হবে—এর পরে দেব। এই ধাক্কাটা সামলে নিই তো। সামান্য টাকা, দিলেই হবে এর পরে।

ভাদ্র মাস পড়বার আগেই ঘুঘু-ডাকা সুদীর্ঘ শ্রাবণের এক দ্বিপ্রহরে নৌকাযোগে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রেখে এল। এত বড় অসুখ থেকে উঠল, বাপ-মায়ের কাছে একবার যাওয়া উচিত।

বিমলা আর ফেরে নি।

শীতের প্রথমে সামান্য জ্বর থেকে দাঁড়াল নিউমোনিয়া, দুর্ব্বল শরীর সামলাতে পারলে না সে ধাক্কা। অতুলের সঙ্গে দেখাও হয় নি শেষ সময়টা। স্বামী—বা দু-পাঁচটা সঞ্চিত টাকা যা পাউডারের কৌটোটাতে ছিল নিজের তোরঙ্গটাতে—সব ফেলে রেখে চলে গেল।

এর পর সাত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে।

অতুলের বয়সও ডাঁটিয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দেখলেই মনে হবে যৌবন বিদায় নিয়েছে কিছুকাল আগে। এখন রাস্তার কনট্রাক্টরি করে হাতে দু পয়সা করেছেও। আগের চেয়ে অবস্থা ঢের ভাল। গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন লোক সে বর্ত্তমানে। এবার স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও নির্ব্বাচিত হয়েছে।

শীতকালের দিন। সে বসে চৌকিদারের মাসিক বেতনের বিল পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে সরোজিনীর (তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী; দুটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়েছে) উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—শোন শোন, শীগ্‌গির ইদিকে এস তো? দেখ দেখ—

কি না জানি বিপদ ঘটেছে ভেবে অতুল ছুটে গিয়ে দেখল স্ত্রী ঘর পরিষ্কার করতে করতে পৈতৃক আমলের যে বাক্সটাতে সাবেক আমলের জমিজমার খাতা, পুরোনো চেকদাখিলা, কাগজপত্র ইত্যাদি আছে তার মধ্যে থেকে কীটদষ্ট বিবর্ণ একটা নেকড়ার পুঁটুলি বার করে হাতে তুলে ধরে বলছে, এই দেখ! আজ ভাবলাম পুরনো বাক্সটা ঝেড়ে-মুড়ে সাফ করি, কাগজপত্তরের ভেতর এই দেখ কি ছিল। কি বল তো এটা? বোধ হয় টাকাকড়ি। খুলে দেখি দাঁড়াও।

পরে দ্বিপ্রহরে পুঁটুলির গেরো খুলে বললে, দেখ দেখ—টাকা আর খুচরো! দাঁড়াও গুণি—

আনন্দপূর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে সে গুণতে লাগল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—ওঃ দেখি—

গোণা শেষ করে খুশির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, হুঁ হুঁ। এ-কিন্তু আমি দেব না। কর্ত্তাদের আমলের রাখা নিশ্চয়ই। এতদিন তোমরা তো কেউ পাও নি। একখানা রুমালে বাঁধা—দেখ না?

অতুল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার একখানা জ্বরদীপ্ত আরক্ত মুখ···ছেলেমানুষের মত লোভার্ত্ত দৃষ্টি··· এক বর্ষার মেঘমেদুর দিন·· শ্রাবণ মাস···

সে শুধু কলের পুঁতুলের মত বললে, কত আছে বললে?

সরোজিনী হেসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, আঠার টাকা সাত আনা। এ আমি আর দিচ্ছি নে! আমি পেলাম, এ আমি নেব।

সুহাসিনী মাসীমা

সুহাসিনী মাসীমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু খুব ছোট বয়সে যখনই মামার বাড়ী যেতুম, তখন সকলের মুখে মুখে থাকত সুহাসিনী মাসীমার নাম।

—সুহাস কি চমৎকার বোনে! এই বয়েসে কি সুন্দর বুনুনির হাত!

—সুহাসিনী বললে, এস দিদি ব'স। বেশ মেয়ে সুহাসিনী।

—সেবার সুহাসিনীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালুম পূর্ণিমার দিন।

—সুহাসিনী ওসব অনেয্য দেখতে পারে না, তাই জন্যে তো মায়ের সঙ্গে বনে না।

সুহাসিনী গ্রামের সকলের যেন চোখের মণি। সুহাসিনী মাসীমা সম্বন্ধে কথা বলবার সময় সবারই অর্থাৎ আমার বুড়ী দিদিমার, গন্থ দিদিমার, মাসীমাদের, মায়ের, মামাদের গলার সুর বদলে যেত, চোখে কি রকম একটা আলাদা ভাব দেখা যেত। আর একটা কথা। রূপের কথা উঠলে সকলেই বলত আগে সুহাসিনী মাসীমার কথা, অমন রূপ কারও হয় না, কেউ কখনও দেখেনি।

শুনে শুনে আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হল যে, সুহাসিনী মাসীমাকে একবার দেখব। দেখতেই হবে।

দিদিমাকে একদিন বললুম, সুহাসিনী মাসীমা এখানে কোথায় থাকেন?

—কেন রে?

—আমি একদিন দেখতে যাব।

—সে তোর ওই কানাই মামার বোন ওপাড়ার। মুখুজ্যেদের দোতলা বাড়ী পুকুরধারে দেখিসনি? তা সুহাস তো এখন এখানে নেই। শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে।

—বিয়ে হয়ে গিয়েছে বুঝি?

—তা হবে না? উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হল, বিয়ে কোন্ কালে হয়েছে।

সুহাসিনী মাসীমার বিয়ে হওয়ার কথাটা যেন খুব ভাল লাগল না। কেন ভাল লাগল না তা কি করে বলব। আমার বয়স ন বছর আর সুহাসিনী মাসীমার বয়স উনিশ-কুড়ি; বিয়ে হলেই বা আমার কি, না হলেই বা আমার কি।

মামার বাড়ীতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে যাই, কিন্তু কোনও বার সুহাসিনী মাসীমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। হয় তিনি বৈশাখের মাঝামাঝি চলে গিয়েছেন, নয়তো তিনি আসবেন শ্রাবণ মাসে শ্বশুরবাড়ী থেকে।

—ফাল্গুন মাসে এসেছিল সুহাস, বোশেখ মাসে চলে গেল। আজকাল থাকে ভাল জায়গায়। যেমন রং, তেমনিই রূপ, যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

অন্য লোকের প্রশ্নের উত্তরে দিদিমা কিংবা আমার মাসীমারা এ ধরনের কথা বলতেন, শুনতে পেতাম। আমি কোনও প্রশ্ন এ-সম্বন্ধে বড় একটা করতুম না, অথচ ইচ্ছে হত সুহাস মাসীমার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার, আরও অনেক কথা শোনবার। কিন্তু কেমন যেন লজ্জায় গলার কথা আটকে যেত, জিগ্যেস করতে পারতুম না।

—না, তা কি করে থাকবে, সুহাসিনী না হলে শ্বশুর বাড়ীর একদিন চলে না—কাজেই চলে যেতেই হল, নইলে জষ্টি মাসে আম কাঁটাল খেয়ে যাবার তো ইচ্ছে ছিল। শাশুড়ি বলে—বৌমা এখানে না থাকলে যেন হাত পা আসে না—বৌমার মুখ সকালে উঠে না দেখলে কাজে মন বসাতে পারি নে।—তাই ছেলে পাঠিয়ে নিয়ে গেল।

—একদিন কি হল জান, দুপুরবেলা সুহাসের ফিট হয়েছে শুনে তো ছুটে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনে সানের রোয়াকে সুহাস অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে—আর তার মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। মাথায় একরাশ কালো কুচকুচে ভিজে চুল, দেহ এলিয়ে পড়ে আছে। অমন রূপ কখনও দেখি নি মানুষের, কি রূপ ফুটেছে সুহাসের—সত্যি—

সুহাস মাসীমার রূপের ও গুণের প্রশংসায় এই গ্রামের সবাই পঞ্চমুখ। তারা জীবনে যেন এমন মেয়ে আর দেখে নি। ওদের মুখে মুখে সুহাসিনী মাসীমাও আমার মনে অত্যন্ত বেড়েই বললেন—কল্পনায়, চোখের দেখায় নয়।

অল্প বয়সে যখন মনের আকাশ একেবার শূন্য, তখন লোকের মুখে শুনে শুনে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ নারীমূর্ত্তি আমার মনে গড়ে উঠেছিল—বহুকাল পর্য্যন্ত এই মানসী নারীপ্রতিমার কষ্টিপাথরে বাস্তবজীবনে দৃষ্ট সমস্ত নারীর রূপ ও গুণ যাচাই করে নিতাম, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয়। সে মানসী প্রতিমা ও আদর্শ নারী ছিলেন সুহাসিনী মাসীমা—যাঁকে কখনও চোখে দেখলুম না।

তখন কলেজে পড়ি। কি একটা ছুটিতে মামার বাড়ী গিয়েছি। তখন অনেকটা গম্ভীর হয়ে পড়েছি আগেকার চেয়ে এবং রান্নাঘরের কোণে বসে দিদিমা ও মাসীমাদের মুখে মেয়েলি গল্প শোনার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে মেজ দাদু ও মামাদের সঙ্গে জার্ম্মান যুদ্ধের আলোচনা ও সে

সম্বন্ধে নিজের সদ্য অধীত লজ-এর মডার্ন ইউরোপের ঐতিহাসিক জ্ঞান 'সগর্ব্বে প্রদর্শন করবার ঝোঁক তখন অনেক বেশি। সকাল বেলা, আমি সমবেত দু-পাঁচ জন লোকের সামনে বিসমার্কের রাজনীতি ও জীবনী (লজ-এর 'মডার্ন ইউরোপ' অনুযায়ী) সোৎসাহে বর্ণনা করছি, এমন সময়ে ওপাড়ার কানাই মামা (সুহাসিনী মাসীমার ছোট ভাই) এসে সেখানে দাঁড়াল।

মেজ দাদু জিজ্ঞেস করলেন—কি কানাই, কবে এলে কলকাতা থেকে?

কানাই বললে—আজই এলুম কাকাবাবু। দিদি আজ ওবেলার ট্রেনে আসবে কিনা। দাদাবাবু পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসবেন। তাই আমি সকালের গাড়ীতে চলে এলুম স্টেশনে গাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে।

শুনে মনে কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করলুম। সুহাসিনী মাসীমা আসবেন আজই, দেখব—এতকাল পরে সুহাসিনী মাসীমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা হবে। আমার মনের সেই মানসী প্রতিমা সুহাসিনী মাসীমা! তার পর আবার নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম নিজের মনের ভাবে। আসেন আসুন, না আসেন না আসুন—আমার কি তাতে?

অথচ সন্ধ্যাবেলার দিকে কাঁটালতলাটায় পায়চারি করছিলুম, বোধ হয় কিছু উৎসুক ভাবেই। এই পথ দিয়েই সুহাসিনী মাসীমার গরুর গাড়ী স্টেশন থেকে আসবে। এই একমাত্র পথ।

সন্ধ্যার কিছু আগে গরুর গাড়ী স্টেশন থেকে ফিরে এল—কানাই মামার ছোট ভাই বীরু তাতে বসে।

জিজ্ঞেস করলুম—কোথায় গিয়েছিলি রে বীরু? গাড়ী গিয়েছিল কোথায়?

বীরু বললে—স্টেশনে। বড় দিদির আসবার কথা ছিল, এল না।

বললুম—রাত্রের ট্রেনে আসতে পারেন তো—

—না, তা আসবেন না। অন্ধকার রাত, মেঠো পথ দিয়ে আসা—রাত্রের গাড়ীতে কখনও আসবে না। কঁথাই আছে।

গাড়ী চলে গেল।

জীবনের গত দশ বছরের মধ্যে—তখন আমার বয়স ছিল নয়, এখন উনিশ—এই প্রথম বার সুহাসিনী মাসীকে দেখবার সুযোগ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু উপক্রম হয়েই থেমে গেল, ঘটল না।

সেদিন কেন, তার পর প্রায় এক মাস সেখানে ছিলাম—সুহাসিনী মাসীমা তার মধ্যেও আসেন নি।

কলেজ থেকে বার হয়ে ক্রমে চাকরিতে ঢুকে পড়লুম। বয়স হয়েছে চব্বিশ, ষোল বছর কেটে গিয়েছে বাল্যের সেই মামার বাড়ীর দিনগুলি থেকে। দিদিমা বেঁচে নেই, মামার বাড়ী যাওয়া আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে, সুহাসিনী মাসীমার কথা শুনতে পাই কেবল আমার

আপন মাসীমাদের মুখে। তাও তত বেশি করে নয় বা তত ঘন ঘন নয়, বাল্যকালে যেমন দিদিমার মুখ থেকে শুনতুম।

কিন্তু তা বলে সুহাসিনী মাসীমা কি আমার মনে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন?

আশ্চর্য্যের বিষয়, তা মোটেই নয়।

বাল্যের সে মানসী প্রতিমা যেমন তেমনই ছিল, তার রূপের কোথাও একটুকু ম্লান হয় নি। বন্ধুবান্ধবের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে কত নববধূকে সেই মানসী প্রতিমার কষ্টি-পাথরে যাচাই করতে গিয়ে তাদের প্রতি অবিচার করেছি।

বয়স যখন ত্রিশ-বত্রিশ, তখন কলকাতায় এসে থাকতে হল কার্য্য উপলক্ষে। একদিন আমার মামার মুখে কথায় কথায় শুনলাম—সুহাসিনী মাসীমার স্বামী এখন বড় এঞ্জিনীয়ার, অনেক টাকা রোজগার করেন, বাগবাজারে নবীন বোসের লেনে সম্প্রতি বাসা করে আছেন। এমন কি মামা বললেন—যাবি একদিন? সুহাস দিদির সঙ্গে আমারও অনেকদিন দেখা হয় নি। তুই কখনও দেখেছিস কি? চল, কাল যাওয়া যাক, ঠিকানাটা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।

পরদিন আমার কি একটা গুরুতর কাজ ছিল, তাতেই যাওয়া হল না। মামাও আর সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করলেন না। আমি ইচ্ছে করলে একাই যেতে পারতাম—মামা ঠিকানাটা আমায় বলেছিলেন তার পর, কিন্তু তারা আমায় কেউ চেনে না, এ অবস্থায় যেচে সেখানে যেতে বাধত।

আরও বছর দুই-তিন কেটে গেল। আমার বয়স চৌত্রিশ। সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে হয়ে পড়েচে অনেকগুলি। পশ্চিমের কর্ম্মস্থান থেকে দেশে ঘন ঘন আসা ঘটে না। এ সময় একবার মামার বাড়ীর গ্রামের কানাই মামার সঙ্গে জামালপুর স্টেশনে দেখা। কানাই আমার বাল্যবন্ধু এবং সুহাসিনী মাসীমার ছোট ভাই।

—কি হে, কানাই মামা যে! এখানে কোথায়?

—আরে শচীন যে! তুমি কোথায়? আমি এখানে আছি বছরখানেক, ওয়ার্কশপে কাজ করি।

—বেশ, বেশ। বাসা করে মেয়েছেলে নিয়ে আছ?

—না, দিদি মুঙ্গেরে রয়েছে কিনা, জামাইবাবুর, শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে। সেখান থেকেই যাতায়াত করি। এস না একদিন? বেলুন বাজারে, গঙ্গার কাছেই। কবে আসবে?

আমি থাকি সাহেবগঞ্জে। সর্ব্বদা মুঙ্গেরের দিকে যাওয়া ঘটে না—তবু কানাইএর কাছে কথা দিলাম একদিন সুহাসিনী মাসীমার বাসায় যাব মুঙ্গেরে।...সেটা কর্ত্তব্যও তো বটে, দেশের লোক অসুস্থ হয়ে রয়েছেন দূর দেশে—আমরা যখন এদেশ-প্রবাসী—যাওয়া বা দেখা-শুনো করা তো উচিতই।

সাহেবগঞ্জে ফিরে এসে স্ত্রীকে কথাটা বলতে সেও খুব উৎসাহ দেখালে।

বললে—চল না মাসীমার সঙ্গে দেখা করে সীতাকুণ্ডে স্নান করে আসা যাবে। কখনও মুঙ্গেরে যাই নি—ভালই হল, চল এই মকর-সংক্রান্তির ছুটিতে—

একথা ঠিকই যে, এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পরে সুহাসিনী মাসীমাকে দেখবার সে বাল্য-ও প্রথম-যৌবন-দিনের আগ্রহ ছিল না—তবুও কৌতূহলে এবং মনের পুরনো অভ্যেসের বশে একদিন মুঙ্গেরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার সঙ্কল্প করলুম। কিন্তু পুনরায় বাধা পড়ল। পৌষ মাসের শেষের দিকে সাহেবগঞ্জে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হল—আমি ছুটি নিয়ে সপরিবারে দেশে পালালুম। দিন উনিশ-কুড়ি পরে যখন ফিরলুম তখন মকর-সংক্রান্তি পার হয়ে গিয়েছে, মুঙ্গেরে যাওয়ার কথাও চাপা পড়ে গিয়েছে।

এর মাস-চার পরে আবার কানাইএর সঙ্গে দেখা জামালপুরে।

বললে—ওহে, তোমরা কই গেলে না? তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলুম—কি বিপদ গেল যে! জামাইবাবু মারা গেলেন ও মাসের সতেরোই।

সুহাসিনী মাসীমা বিধবা!

বললুম—ওঁরা এখনও কি—

—না না। দেওর এসে নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ী। মস্ত ডাক্তার দেওর—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-সার্জন, গভর্নমেণ্ট সার্ভিস করে। জামাইবাবুর চেয়ে অনেক ছোট।

এইবার চার-পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান—যখন সুহাসিনী মাসীমার কথা কারও কাছে শুনি নি। তার পর একদিন আমার মাসীমা কাশী থেকে এলেন। বাল্যকালের সে দিনটি থেকে কতকাল চলে গিয়েছে—যে মাসীমা তখন ছিলেন তরুণী, তিনি এখন কাশীবাসিনী। আমারও বয়স উনচল্লিশ।

মাসীমা বললেন—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ সুহাসিনীদিদির সঙ্গে দেখা হত কিনা। চমৎকার মেয়ে সুহাসিনী দিদি, ওর সঙ্গে মিশে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত। মস্ত বড় সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। কি সুন্দর গীতার ব্যাখ্যা করে। ওর মুখে গীতাপাঠ শুনতে শুনতে রাত যে কত হচ্ছে তা ভুলেই যেতুম। আহা, কি মেয়ে সুহাসিনী দিদি!

বহুকাল পরে সুহাসিনী মাসীমার আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলাম।

সুহাসিনী মাসীমা চিরকাল লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে গেল—কপাল এক-একজনের। আমার ঠোঁটের আগায় এ প্রশ্ন কতবার এল—সুহাসিনী মাসীমা আজকাল দেখতে কেমন?··· বহুকাল তাঁর রূপের প্রশংসা কারও মুখে শুনি নি।

কিন্তু আমার মনের সেই বাল্যকালে গড়া মানসী রূপসী সমানই ছিলেন। বাল্যে তিনি ছিলেন শুধু রূপবতী, এখন রূপের সঙ্গে যোগ হল আধ্যাত্মিকতা। সুহাসিনী মাসীমা একেবারে দেবী হয়ে উঠলেন আমার মনে। আর এটাও মনে রাখতে হবে, দেবীদের মধ্যে সবাই তরুণী—বৃদ্ধা দেবী কেউ নেই।

পরের বছরই আমার চাকরির কাজে আমায় কাশী যেতে হল তিন চার দিনের জন্যে। আমার বয়স চল্লিশ। মাসীমা যে বাড়ীটাতে থাকতেন, সেখানে মামার বাড়ীর গ্রামের আর একজন বৃদ্ধা থাকতেন। তাঁর নাম তারকের মা—তিনি জাতে কৈবর্ত্ত, তাঁর ছেলে তারকের নৈহাটিতে বড় দোকান আছে। আমার ওপর ভার পড়ল, তারকের মায়ের কাছ থেকে মাসীমার একটা হাত-বাক্স নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

বেলা দশটা। মন্দিরাদি দর্শন করার পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে নামছি। সঙ্গে আছে তারকের মা।

তারকের মা স্নানার্থীদের ভিড়ের মধ্যে কাকে সম্বোধন করে বললে—দিদি ঠাকরুনের আজ যে সকাল সকাল হয়ে গেল?—যাকে উদ্দেশ করে বলা গেল তিনি কি উত্তর দিলেন আমি ভাল করে শোনার আগেই তারকের মা আমার দিকে চেয়ে বললে—চিনতে পারলে না শচীন? আমাদের গাঁয়ের কানাই-এর দিদি সুহাসিনী—চেন না?

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে দেখি একজন মুণ্ডিত-মস্তক, স্থূলকায়া বৃদ্ধা, এক ঘটি জল হাতে সিক্ত-বসনে উঠে চলে যাচ্ছেন। ফর্সা রং জ্বলে গেলে যেমন হয় গায়ের রং তেমনই, মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে—নিতান্ত নির্ব্বোধ নিরীহ পাড়াগাঁয়ের বুড়িদের মত মুখের চোখের ভাব।

সেই সুহাসিনী মাসীমা!

আমি কি আশা করেছিলুম এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরেও সুহাসিনী মাসীমাকে রূপসী যুবতী দেখতে পাব? তবে কেন যে ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কেন যে মন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—কে জানে।

বড় ক্লান্ত বোধ করলুম—ভীষণ ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ। ভাবলুম কাশীর কাজ তো মিটে গিয়েছে, মাসীমার বাক্সটা নিয়ে ওবেলার ট্রেনেই চলে যাব। থেকে মিছিমিছি সময় নষ্ট।

অভিশাপ

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী? সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজনধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনও আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাতচেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান ছায়াবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপ-

নারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দ্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই হতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দ্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দূরান্তরের এক অপূর্ব্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকি বাঘে গরুতে নির্ব্বিবাদে একই ঘাটে জল পান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্দ্ধিষ্ণু প্রতিপত্তি-শালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরী-বংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার-স্বরূপ ধূর্জ্জটি-নারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জ্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁরই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বারাক-পুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্য্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে বারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্ম্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেই তরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।

ইতিপূর্ব্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রতা ও প্রচুর মকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু

হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়! বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূর দক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিঁখুত ভাবে মকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্ত্তক্রন্দনে নিঃশব্দরাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনও ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বালবিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহির-বাড়ীতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিকার-স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবধূ বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখীমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখী মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোন স্ত্রীলোকের বাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দ্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ-রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের মহল্লায় তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজ্যজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্ব্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্ত্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্ম্মা দিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত

করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ!

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে?…ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্। কতদূর থেকে আসছে?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাঁহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

কোন উত্তর পাইলেন্ না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিভব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল,—না—না, আমি রানী হ'তে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথা শেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এখন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল! সেই রমণী কহিল, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার ভাল হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভাল আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন! আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তবে আমার অভিশাপ কখনও সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপনারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ঐ অবলায় সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর

পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাঁহার ছিল না! তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রাণী শ্রীক্ষীরোদাসুন্দরীও তাঁহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাত দিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পর-স্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখ্‌নউ, দিল্লী, আগ্রা, বেনারস, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজিকুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুর-লহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলেন যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়ীতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়ীতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়ীতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন। কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই। দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন!

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করনারায়ণ যখন নাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার ভিক্ষোপজীবিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শঙ্করনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি লইয়া। ইংরেজি শিক্ষায় তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অধিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব

জাগিয়া উঠিল ; তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়ীতে খাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়া বসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোন বন্দিনী বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী যেন ঐ ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শঙ্করনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতা সহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই তাঁহার গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন দেবতা আবার যেন চৌধুরীবংশের নষ্টসম্পদ ফিরাইয়া দেন।...

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শঙ্করনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, কাছা, পথ ছাড়, আমায় যেতে দে।

শঙ্করনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয় নি?

—মা। আমি রক্ত চাই!

—কার রক্ত মা?..

—তোর ছেলের!

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শঙ্করনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হায়রে, এ কি পরীক্ষা,

ভোর! তখনও তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শঙ্করনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীরপদক্ষেপে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাঁহার পুত্র মাতার স্তন্যপান করিতেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শঙ্করনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল; কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে, এই সান্ত্বনার পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল?

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন, ওগো, কথা কও, কথা কও! আমার খোকাকে এনে দাও!

শঙ্করনারায়ণ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হৌক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কুলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।...

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনও সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও এমনি ঝড় উঠিয়াছিল; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ঐ শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছটার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।